Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

"...বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তিহননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গণবার্তা

সম্পাদকীয়	১
দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা...	১
দেশে-বিদেশে	২
আদানির প্রতারণা কি মোদীর শেষের শুরু	৩
কম.সৌরীন ভট্টাচার্য-স্মারক বক্তৃতা	৪
ইতিহাসের বিকৃতি...	৫
সংকটের যাঁতাকলে	৬
পুঁজিবাদের বিবর্তন (২য় পর্ব) মোদী-আদানির ফাঁস	৭
আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করছে	৮

70th Year 24th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 11th February 2023

সম্পাদকীয়

মোদী-আদানি প্রসঙ্গে সংসদে গণতন্ত্র পদদলিত করেছে বিজেপি

সম্প্রতি সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং গৌতম আদানির সম্পর্ক এবং বিজেপির শাসনকালে আদানি গোষ্ঠীর উল্কাসম উত্থান, অর্থাৎ মাত্র নয় বছরে ১.৯ বিলিয়ন ডলার থেকে ২৬ বিলিয়ন ডলারের মালিক হওয়ার বিষয় নিয়ে অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক দল সরব হয়েছিল।

অর্থনীতির পুঁথিপুস্তকে রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে দুর্নীতিবাজ পুঁজিপতিদের মেলবন্ধনের যেসব উদাহরণ রাখা হয়, তার মধ্যে মোদী-আদানি সম্পর্কটি প্রকৃষ্টতম। বাজেট আলোচনার প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী, এন কে প্রেমচন্দ্রন সহ অধিকাংশ সাংসদ একটি মুখ্য অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন। বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যস্ফীতির প্রশমনের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত বা একশ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন খাতে ভরতুকি বৃদ্ধির ন্যূনতম দিশা দেখাতে অর্থমন্ত্রী ব্যর্থ। বরঞ্চ প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সিংহল, বাংলাদেশ, নেপাল সহ বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলিতে বিলগ্নিকরণের প্রক্রিয়ায় তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে আদানির অর্থভাণ্ডারের স্ফীতির বিষয় ও তথ্য বিরোধী দলের সাংসদরা তুলে ধরেছেন, ততই যেন মোদী ও তাঁর দল মূল প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে কার্যত বধির এবং নীরব থেকেছেন।

শুধু তাই নয়, বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আদানির উত্থানের প্রসঙ্গে জেপিসি গঠনের ন্যায্যতার বিষয়টি এড়িয়ে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত দুর্বৃত্তদের মতো বিরোধীদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলি টেনে এনেছেন। এমনকি, বুক বাজিয়ে মেঠো কুস্তিগীরদের মতো বলেছেন যে, দুনিয়ার ও দেশের সবাই একদিকে থাকলেও তিনি একাই নাকি পাঙ্গা নিতে পারেন।

ফ্যাসিবাদের যে তিনটি মূল উপাদান অত্যাচার, নিপীড়ণ-এর পাশাপাশি সর্বব্যাপী সম্মতির আবহ নির্মাণ করে গত কয়েকবছর ব্যাপী সেই অনুশীলন যেন শীর্ষবিন্দুর কাছাকাছি পৌঁছেছে। ভুল তথ্য উপকথা ইত্যাদি নির্ভর সদম্ভ বাগ্মীতার বাগাড়ম্বর, সমস্ত গণতান্ত্রিক স্তম্ভগুলি বিকৃত করে সীমাহীন দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রিক প্রাতিষ্ঠানিক তথা বিপথচালিত সাংগঠনিক কর্মীদঙ্গলের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জাতপাত-সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আবহের পূর্তি। নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে, অর্ধসত্যের উপস্থাপনা এবং বিরোধীকণ্ঠ রুদ্ধ করার ঘটনার সাক্ষী থেকেছে অর্ধসমাপ্ত বাজেট অধিবেশনের দুটি কক্ষই। প্রধানমন্ত্রী কখনও নেহরু পরিবারকে অনৈতিক পদ্ধতিতে আক্রমণ করেছেন, কখনও অর্ধশিক্ষিতের মতো হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট মনীষীদের সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন। তিনি এদেশে বিবিসির তথ্যচিত্র বেআইনি ঘোষণা করেছেন, হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টকে দেশদ্রোহী চক্রান্ত বলেছেন। অথচ জানেন না বা বলতে ভয় পেয়েছেন, টাইমস ওয়ালস্ট্রীট জার্নাল, ইকনমিস্ট বা ব্লুমবার্গের মতো সংস্থা মোদী-আদানির স্যাঙাৎ-সম্পর্ক সম্বন্ধে কি ধরনের নেতিবাচক বিশ্লেষণ করেছে। কংগ্রেসের উত্থান পতন সম্বন্ধে হার্ভার্ডের গবেষণা কতটুকু হয়েছে না জেনেই তার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ তুলেছেন। অথচ ইতিমধ্যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে অসহিষ্ণুতার রাজনীতি অর্থনীতি সম্বন্ধে যে গবেষণায় হার্ভার্ডে ও অক্সফোর্ডে যে সমালোচনার জোয়ার দেখা যাচ্ছে—সে বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর ঔদ্ধত্য ও অজ্ঞানতা প্রমাণিত হয়েছে। এতই নির্লজ্জ ও বেপরোয়া বিজেপি দলটি যে, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সংসদ থেকে কার্যত আদানি প্রসঙ্গ এড়িয়ে পালিয়ে যান, তিনি ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে সামান্যতম সংকোচও বোধ করেন না।

বিজেপি এই মুহূর্ত থেকে যেভাবে মূল ধারার মিডিয়ার ওপর সর্বাত্মক দখলদারি করেছে, সেভাবে শীর্ষ আদালতে একের পর এক বিচারপতিকে অবসরের পর লোভনীয় পদে অধিষ্ঠিত করে বাকি বিচারপতিদের কাছে সংঘ পরিবারের পদতলে আত্মসমর্পণের বার্তা পাঠাচ্ছে। রামমন্দির সম্পর্কিত রায় দিয়ে রঞ্জন গগৈ-এর মতো পুরস্কৃত হতে চলেছেন বিচারপতি আব্দুল নাজির এবং অশোকভূষণ। নাজির অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল এবং অশোকভূষণ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। এভাবে অতিদ্রুততার সঙ্গে একদিকে গরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক ভোট দখল করার জন্য হিংসাত্মক রাজনীতি, অপরদিকে ক্ষমতার শক্তিতে সর্বাত্মক সম্মতি গঠনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ও দুর্নীতিবাজ পুঁজিপতিদের সহায়তায় কর্পোরেটপুঁজিবাদের একনিষ্ঠ পাহারাদার দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে।

দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা মোদী সরকারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য

এই সরকারের পতন সম্ভব করতেই হবে

১ ফেব্রুয়ারি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি এক অনন্য অর্থনীতিশাস্ত্রী, যাঁর অর্থমন্ত্রীত্বকালে দেশের সাধারণ জনজীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। বাস্তব পরিস্থিতি অস্বীকার করে দেশের মানুষের জীবনে ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করে চলেছে এই সরকার। তিনি পর পর পাঁচবার এদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সবিস্তারে লোকসভায় পেশ করলেন। পুরাকালে রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নিরো নাকি প্রজাদের অশেষ দুর্দশায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইে যন্ত্রসঙ্গীত উপভোগ করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ। তেমনভাবেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ভারতেশ্বরের সিংহাসন দখলের পর থেকেই দেশের মানুষের ন্যূনতম স্বার্থ রক্ষায় বিফল হলেও সংসদে টেবিল বাজিয়ে তাঁর বিকৃত রুচির উল্লাস প্রকাশ করে গেলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ঔদ্ধত্য বা ক্ষমতামদমত্ততা কোন পর্যায়ে পৌঁছলে এমন মানসিক বিকৃতির প্রকাশ ঘটে তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়।

নয়া উদারবাদী আবহে বাজেট বক্তৃতার প্রাসঙ্গিকতা আর নেই। অনেককাল যাবৎই নেই। কিছু প্রথা অনুসরণ করা ছাড়া এই বক্তৃতার মধ্যে অন্য কোনো সদর্থক কিছু সন্ধান করা বৃথা। প্রধানমন্ত্রী মোদী বা তাঁর প্রশ্রয়ধন্যা অর্থমন্ত্রী দেশের অভূতপূর্ব কর্মহীনতার সমস্যা সম্পর্কে বাজেট বক্তৃতায় সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। অন্য আর একটি প্রধান সমস্যা মূল্যস্ফীতি নিয়েও সরকার ভাবিতই নয়। মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় স্বীকার করা হল যে ভারতে এখন সাত শতাংশেরও বেশি বেকারত্বের জ্বালায় জর্জরিত। সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকনমি বা সি এম আই ই'র মতো অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে যে, প্রকৃত বেকারত্বের সমস্যায় দীর্ণ অন্ততপক্ষে আট শতাংশেরও বেশি। নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছেই না। কোভিড অতিমারির আগেই ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গভীর সংকটে পড়েছিল। নরেন্দ্র মোদীর চমক সৃষ্টিকারী নোট বন্দি ও অযাচিত দ্রুততায় জি এস টি চালু করার অবিমৃশ্যকারিতা এদেশের ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির ধ্বংসসাধন করেছে। এই সব শিল্প সংস্থাগুলিতেই বেশি সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হত। অসংগঠিত ক্ষেত্র হলেও এইসব সংস্থাগুলি অন্ততপক্ষে একটি জীবিকা সংস্থার সদর্থক ভূমিকা পালন করতো।

ভারতে বিগত প্রায় দশ বছরে অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর অপশাসনকালে কোনও বড় শিল্প সংস্থার শ্রমনিবিড় কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে লাভজনক বলে বিবেচিত হচ্ছিল, সেগুলিও জলের দরে সরকারের পেটোয়া ধনকুবেলদের হাতে গচ্ছিত করা হয়েছে। আদানি-আম্বানির সরকার কোনভাবেই সাধারণ জীবনের বিষয় ধর্তব্যের মধ্যেই আনে নি। নতুন কোনও সরকারি হাসপাতাল গড়ে ওঠেনি। নরেন্দ্র মোদী অসংখ্যবার বিলাসবহুল আয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ করলেও উল্লেখযোগ্য কোনও প্রযুক্তি ভারতে আসেনি। দেশের সম্পদই শুধু ব্যয় করে নিজের মনের আশ মিটিয়ে গেছেন।

বন্ধু আদানির মতো ফেরেববাজ ফাটকা পুঁজির কারবারিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই তাঁবেদার মোদী ভক্তও তাঁর কোন ব্যবসায়ী কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধুই হেরাফেরি করে গেছে শেয়ারবাজারে। অবশ্যই মোদীর প্রত্যক্ষ সহায়তা সর্বদাই ভোগ করেছে এই ধরনের ধনকুবেররা। এবারের বাজেট বক্তৃতায় নির্মলা সীতারামন একবারের জন্যও দেশের কর্মহীন বা কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের জীবন যন্ত্রণার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না।

ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৭ শতাংশ যুব বয়সী। এরাই দেশের ভবিষ্যৎ। অথচ বর্তমান সরকার এদের ন্যূনতম মর্যাদা দিতেও ইচ্ছুক নয়। বরং বলা চলে, এদের ভবিষ্যৎকে আরও বেশি সমস্যাসঙ্কুল করে তুলতে বদ্ধপরিকর। এমনকি, গ্রামীণ ক্ষেত্রে অল্পবয়সী থেকে কর্মক্ষম মধ্যবয়সীরা পর্যন্ত বিগত প্রায় ১৭-১৮ বছর যাবৎ এন আর ই জি এ মারফৎ যে মাত্র ১০০ দিনের উপার্জনের গ্যারান্টি পেয়েছেন তাও এবারের বাজেটে প্রায় ৩০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হল।

দেশের শিল্পক্ষেত্রে চরম গতিহীনতা এক দুর্মর সমস্যার বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকার এ প্রসঙ্গে পূর্ণত উদাসীন। একদিকে চাহিদার ক্রমহ্রাস এবং অন্যদিকে সমস্ত জিনিসের আকাশস্পর্শী মূল্যবৃদ্ধি এক জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট এ প্রসঙ্গে দিশাহীনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ যথাযথ পুষ্টিগুণ সহ খাদ্য পাচ্ছেন না। অপুষ্টিজনিত বৈকল্য বিপুল অংশের শিশুদের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি স্তব্ধ করে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের অবস্থান লজ্জাজনকভাবেই নিম্নগামী। সামাজিক ক্ষেত্রে যেটুকু ব্যয় বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন তাও উপেক্ষিত নির্মলা সীতারামনের বাগাড়ম্বরে পূর্ণ বাজেট ভাষণে। আসলে মনে হয়, কোভিড পরবর্তীকালে ভারতের বর্তমান শাসককুল নিজেদের সৃষ্ট গহ্বর থেকে আর বাইরে আসতে পারছে না। এমন আর্থিক সমস্যা যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে তখনই লক্ষণীয় ভারতের শাসকদল বিজেপি এবং তাদের পথ নির্দেশ দেওয়া আর এস এস একযোগে দেশের মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটিয়ে নিজেদের চরম অপদার্থতা গোপন করার অপপ্রয়াস করে চলেছে। হিন্দু-মুসলমান- খ্রিস্টান-শিখ প্রভৃতি কোনও অংশেরই সাধারণ মানুষের জীবনে যতটুকু নিরাপত্তা থাকা একান্ত জরুরি তা-ও থাকছে না। বর্তমান সরকার সবটাই জুমলা বা ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বেপরোয়া আচরণ করে চলেছে। এই সরকারের আর কোনও নৈতিক অধিকারই নেই দেশের শাসনক্ষমতায় থাকার। বাস্তবে এদের দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনাই দেশের মানুষের জীবনে ন্যূনতম নিরাপত্তা লোপাট করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন তীব্রতর করার মাধ্যমেই শ্রমজীবী মানুষকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এরপর ৪ পাতায়

উগ্র মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইরানের নারী সমাজ

ভারত আর ইরানের দূরত্ব খুব বেশি না হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই দেশের বৈপরীত্য বেশ চোখে পড়ে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশ ইরানের নারী সমাজ বাধ্যতামূলক হিজাব পরিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সেখানে ভারতের কর্নাটকের বিদ্যায়তনে হিজাব নিষিদ্ধকরণের সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে ছাত্রীরা ধর্মীয় আচরণে সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছে। আপাতদৃষ্টিতে দুই দেশের প্রতিবাদ বিপরীতধর্মী মনে হলেও, দুই দেশের নারী সমাজের সাধারণ দাবি, পোশাক বিষয়ে ব্যক্তিগত অধিকারের, ব্যক্তিগত পছন্দের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

অবশ্য ইরানের প্রতিবাদ এখন শুধু হিজাবের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ নয়। ইরানের লড়াইটা এখন পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনতাকেন্দ্রিক এবং উগ্র মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ইরানে এখন হিজাব বিরোধী আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে।

ইরানে গণ আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস থেকে বর্তমানের আন্দোলনকে পৃথক করে দেখা যায় না। ১৯৩৬ সালে ইরানের মহিলাদের আধুনিক করার তাগিদে ওই সময় ইরানের প্রায় সর্বত্র মহিলাদের হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পথে ঘাটে বলপূর্বক মহিলাদের হিজাব টেনে খুলে দেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত পুলিশকে দেওয়া হয়েছিল। ইরানের মহিলা সমাজ সরকারি আন্দোলনকে শাহ'র পুলিশের জুলুমবাজি বলে মনে করতেন, ইরানের মহিলা সমাজের কাছে হিজাব পরাই ছিল পোশাকের ব্যাপারে স্বাধীনতার দাবি। হিজাব জনপ্রিয় না হলেও, হিজাব হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। পহেলবী রেজা শাহের পরবর্তী জমানায় এই আইন অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। ১৯৭৯ সালে ধর্মগুরু আয়াতোল্লা খোমেইনির জমানায় হিজাব ফিরে আসে, হিজাব ইসলামি শাসনতন্ত্রের প্রতীকে পরিণত হয়।

শুধু হিজাব প্রত্যাবর্তনই নয়, ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের (?) পর নানাভাবে নারী স্বাধীনতা হরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ২০১১ সালে সংশোধিত পারিবারিক আইনে মেয়েদের বিবাহের বয়স কমানো হয়, বহু বিবাহ প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত হয়। বর্তমানের চলমান ইরানের আন্দোলনে ইরানের মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা থাকলেও, সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ইরানের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বর্তমানের ইসলামি রিপাব্লিক শাসনতন্ত্রের অবসান চায়। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে ইরানের জনআন্দোলন ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে, ইরান সরকার নিজ দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সরকারের নির্মম দমননীতিকে উপেক্ষা করে ইরানের সর্বস্তরের মানুষ সবাই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলে ইরানের জাতীয় ফুটবল দল তাঁদের প্রথম ম্যাচে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় নীরব থেকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ইরানের ফুটবল টিমের অধিনায়ক এহসান হাজসাকি সাংবাদিকদের সম্মেলনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন :—

আমাদের দেশের পরিস্থিতি ভালো নয়, আমাদের জনগণ সুখী নয়, ...আমি আশা করি জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। ইরানের ফুটবল দল দেশে ফিরে তাঁদের প্রতি সম্ভাব্য শাস্তি সম্বন্ধে সচেতন থেকেও বিশ্ববাসীকে ইরানের জনগণের আন্দোলনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন।

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে বিশেষত নারী সমাজের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুধু ইরানের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও অভূতপূর্ব।

আর এস এস তাদের তরুণ সমর্থকদের "অগ্নিবীর" হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে

সুবিদিত তথ্য ; চাহিদার তুলনায় জোগান খুব বেশি হলে পণ্যমূল্য তলানিতে এসে ঠেকে। দেশের শ্রম শক্তির চাহিদার তুলনায় বেকার বাহিনী অর্থাৎ মজুত শ্রমবাহিনী বিপুল বলে দেশের যুবসম্প্রদায় যে কোনো মূল্যে অন্নসংস্থানের জন্য আত্মবিক্রয়ে বাধ্য হচ্ছে। আজকের ভারত বিশ্বের সর্বনিম্ন মজুরি প্রদানকারী দেশ এবং একই সঙ্গে এদেশে কর্মীরা 'সর্বাধিক শ্রম সময় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, অর্থাৎ চাহিদা বনাম জোগানের ভারসাম্যহীনতাই এমন পরিস্থিতির কারণ।

সাম্প্রতিক কালে সামরিক বাহিনীতে 'অগ্নিপথ' প্রকল্প ঘোষণায় দেশে বহু জায়গায় যুব সমাজের ব্যাপক বিক্ষোভ সীমাহীন বেকারত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের নামে দেশের যুব সমাজকে যেভাবে কামানের খোরাক হিসেবে গড়ে তোলার পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তা একই সঙ্গে কৌতুককর এবং নিষ্ঠুরতাও বটে।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চাকরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা উধাও হয়েছে। কিন্তু সেনাবাহিনীতে যুবসমাজকে নিয়োগের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সেনাবাহিনীর মধ্যে একদল গুণ্ডাবাহিনী নির্মাণের প্রকল্পের এক অতুলনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নব নিযুক্ত গুণ্ডাবাহিনী শত বঞ্চনা সত্ত্বেও, চাকরি বজায় রাখার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করবে, প্রভুর সেবা করবে এবং চার বছর পর (মাত্র চার বছর) চাকরির মেয়াদ শেষ হলে নিরাপত্তা রক্ষী (আদতে শাসক দলের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী) হিসাবে নিয়োজিত হতে পারে। অগ্নিবীরেরা পাবে না নিয়মিত সৈনিকের সমতুল্য বেতন, না পাবে সেনাবাহিনীর প্রাপ্ত অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা বা সামাজিক নিরাপত্তা। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম সারিতে থেকে এই অগ্নিবীরেরাই হবে কামানের প্রথম খোরাক। আমরা জানি, গ্রামের যুব সম্প্রদায়ের একাংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৈনিক পদে নির্বাচিত হয়। উচ্চপদগুলিতে সাধারণত নিযুক্ত হয় সম্ভ্রান্ত উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা।

প্রসঙ্গত ক্ষুধা সূচক, মানব উন্নয়ন সূচক ইত্যাদিতে ভারতের অবস্থান নিম্নগামী হলেও অস্ত্র আমদানিতে ভারতের অবস্থান শীর্ষে। সৈনিকদের মধ্যে এক অর্থনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি করলো নরেন্দ্র মোদীর সরকার। একদল ভবিষ্যত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা অবলম্বন করে যুদ্ধে যাবে অপর দল (অগ্নিবীরেরা) জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ করবে চরম অনিশ্চয়তাকে মাথায় রেখেই।

এমন পরিস্থিতিতে আর এস এস তাদের তরুণ সমর্থকদের প্রতি 'অগ্নিবীর' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বলাবাহুল্য, সুপরিকল্পিত 'অগ্নিবীর' প্রকল্প আসলে সরকারি খরচে সশস্ত্র আর এস এস বাহিনী গঠনের প্রথম পদক্ষেপ। প্রশ্ন উঠতেই পারে—মাত্র চার বছরের মধ্যেই অগ্নিবীরদের কার্যকাল সীমাবদ্ধ থাকবে কেন।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, জার্মানীতে হিটলার অনুপ্রাণিত গুণ্ডাবাহিনী নির্মাণের ইতিহাসও।

পি এফ আই নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে

তিন বছর আগের এন পি আর-এন আর সি-সি এ এ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস হয়ত অনেকেরই মনে আছে। ঐ সময় থেকেই বিজেপি আর এস এস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার পি এফ আই (পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া) সহ বেশ কয়েকটি গণসংগঠনকে তীব্র আক্রমণের নিশানা করেছিল। সংবাদ মাধ্যমের একাংশকে ব্যবহার করে লাগাতার পি এফ আই বিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছিল।

প্রসঙ্গত বিভিন্ন প্রান্তে বহু সংখ্যক ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও প্রতিবাদী মানুষের সাথে পি এফ আই ও সি এ এ-এন পি আর - এন আর সি'র বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ আর এস এস বিজেপি চক্র ইউ এ পি এ আইনে পি এফ আই, ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া সহ নটি সংগঠনকে গত সেপ্টেম্বরে নিষিদ্ধ করেছে।

নিষিদ্ধ ঘোষণার আগেই এন আই এ - সি আর পি এফ -পুলিশবাহিনী পি এফ আই প্রভাবিত মহল্লাগুলিতে ব্যাপক সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করেছিল। নিষিদ্ধ ঘোষণার পর বন্ধ করা হয়েছে এই সংগঠনগুলির সদর দপ্তর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। প্রসঙ্গত উল্লিখিত সংগঠনগুলি রেজিস্টার্ড সংগঠন হিসাবে প্রতিবছরই সরকারের কাছে তাদের কাজকর্মের জমা খরচের হিসাব দিয়ে এসেছে। তাহলে মৌলবাদী হিংসাশ্রয়ী সংগ্রামী কার্যকলাপের মদতদাতা হিসাবে এদের রেজিস্ট্রেশন এতদিন কিভাবে টিকে ছিল। আসলে আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই ক্ষমতাসীন সরকার ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে উল্লিখিত সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করেছে।

পি এফ আই'র বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপেরও অভিযোগ আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতবর্ষে এমন কোনো বৃহৎ রাজনৈতিক দল আছে কি যাদের বিরুদ্ধে হিংসা, হত্যাকাণ্ডে বা গণহত্যার অভিযোগ নেই? তাহলে সরকারকে উত্তর দিতে হবে হিংসাশ্রয়ী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও নিষিদ্ধ করা হবে না কেন?

উপরন্তু, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় হলেও, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন রাজ্য এফ আই এ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনী অত্যন্ত আপত্তিকরভাবেই রাজ্য সরকারগুলিকে কিছু না জানিয়ে পি এফ আই অফিসে তল্লাশি করেছে, নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে, পি এফ আই এবং অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে এই অবাঞ্ছিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে আর একবার প্রমাণিত হয় দেশের সংবিধানে উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধতা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চমক সৃষ্টিকারী ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এক নতুন নির্দেশিকা ঘোষণা করেছে। দেশের মানুষ চমৎকৃত (!) মঞ্জুরী কমিশনের ঘোষণায়। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এদেশে ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেওয়া হবে, অর্থাৎ আশা করা হচ্ছে দুনিয়ার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশের ছাত্রছাত্রীরা দেশে থেকেই পড়াশুনা করার সুযোগ পাবে সরাসরি, ভার্চুয়াল নয়।

যদি এমন ঘটনা ঘটে আমাদের তো চমৎকৃত হতেই হবে। শিক্ষায় এমন বৈপ্লবিক সংস্কারকে স্বাগত জানানোর আগে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অর্থাৎ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে পরখ করা বা তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

এই তথাকথিত সংস্কার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাথা থেকে নির্গত হয়েছে কতকগুলি অবাস্তব প্রত্যাশা থেকেই। দেশের বিদগ্ধজনদের কাছে প্রশ্ন, বিশ্বের সেরা বিদ্যালয়গুলি যথা, প্রিন্সটন, ইয়েল, ষ্ট্যানফোর্ড, অক্সফোর্ড ইত্যাদি ভারতে তাদের ক্যাম্পাস খোলার আগে এতাবৎকাল অন্যান্য দেশে ক্যাম্পাস খোলেনি কেন?

অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উদার নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শাখা নেই কেন? বেশ গোলমেলে প্রশ্ন, কেনই বা উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে ক্যাম্পাস খুলতে আগ্রহী হবে? বিশ্বের উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থনীতি বা সাংগঠনিক চরিত্র বা পড়াশুনার মান বজায় রেখে বিদেশের মাটিতে ভিন্ন পরিবেশে সমমানের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব বাস্তবত অসম্ভব বলেই মনে হয়।

বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় চার শতাধিক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস আছে ঠিকই কিন্তু, গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া, এদেশের কোনোটাই উচ্চমানের নয়। এটাই ঘটনা, বাস্তব সত্য। তাছাড়া বিদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এক বড় অংশই ঐ দেশের সরকারের কাছে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি পায়, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের উপরও ভর্তুকির পরিমাণ নির্ভর করে। উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তুকির পরিমাণও বেশি।

জনগণের পয়সায় ভারত সরকারের উচ্চমানের বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বহন করার প্রস্তাব যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। তাছাড়া আরও নানা সমস্যা আছে। যদি কোনো বেসরকারি সংস্থা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান বজায় রাখতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, তার জোগানই বা আসবে কোথা থেকে?

মুনাফা অর্জনকারী কোনো বেসরকারি সংস্থা পকেটের পয়সা খরচ করে এমন প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেবে, এমন ভাবনাও বাতুলতা মাত্র। দেশে উচ্চমানের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে হলে, বিপুল পরিমাণ পুঁজি, মানবসম্পদ এবং দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধনের প্রয়োজন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কোনো ধারণা নেই বলেই, এদেশে বিদেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমমানের ক্যাম্পাস খোলার ঘোষণা আসলে চমক সৃষ্টি করার এক অপপ্রয়াস বলেই মনে হয়।

আদানির প্রতারণা কি মোদীর শেষের শুরু

মনোজ ভট্টাচার্য

গৌতম আদানির মতো বিশ্ববিখ্যাত ধনকুবের যে কোনো সমস্যায় পড়তে পারেন তা, অবশ্যই জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে! এমনই দাবি বিজেপি নেতাদের। মোদী জমানায় জাতি এবং রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় সরকার একার্থক হয়ে পড়েছে। আর রাষ্ট্রীয় সরকার মানে অবশ্যই একমাত্র নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। তাঁর অস্তিত্ব, সম্মান, ভাবনা সবটাই রাষ্ট্র হিতে বলেই প্রচার। এহেন এক ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ স্যাঙ্গাৎ গৌতম আদানিকে সমস্যা থেকে মুক্ত করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ তো ভারতের বর্তমান সময়ে বিবেচিত জাতীয়তাবাদী কর্তব্য। আর এস এস-এর তাই মত। এ প্রসঙ্গে মোদীর নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং তাঁর সরকারের উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে না। তিনি মানেই তো ভারতের সরকার এবং তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছাই সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত। সরকারের অন্য কোনো কর্তা দৃশ্যমান নয়। মোদী ও শাহ যা করবেন তা-ই সকলের মান্যতা পাবে। অন্য কিছু ভাবনা প্রকাশ্যে এলে তা নিঃশব্দ শাস্তির বিধান হবে।

সেই কারণে এক তাঁবেদার পুঁজিপতি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। আদানি সাম্রাজ্যের কোনো এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক সেই কারণেই পাশে জাতীয় পতাকা রেখে দাবি করতে পারেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ একান্তভাবেই ভারতের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে গভীর ষড়যন্ত্র করেছে। বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজস্ব অশেষ গুণবত্তায় আদানি প্রায় শীর্ষস্থান দখল করেছিল! তার অবনমন ঘটাতে পারলেই বিশ্ব সমাজে ভারতের ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে পড়বে। হঠাৎ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতার উদ্ভট প্রয়াস! এমন সব আজগুবি দাবি যিনি করলেন, তিনি নাকি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। অর্থাৎ ভারতের জাতীয় ভাবমূর্তির ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র এদিক ওদিক হলে মাথাব্যথা জনৈক ভিনদেশি নাগরিকের!

এই কর্পোরেট কর্তা আরও বলেছেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পর্যায়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। নির্দেশ দিয়েছিলেন এক ব্রিটিশ আধিকারিক কিন্তু ভারতীয়রাই ভারতীয়দের হত্যা করেছিল। এর নিহিত অর্থ, আমেরিকার একটি কোম্পানী যা বলেছে তা নিয়ে ভারতীয়দের উৎসাহিত হওয়া উচিৎ নয়।

নরেন্দ্র মোদী সাধারণত পান থেকে চুন খসলেই নিজস্ব কায়দায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান। মিথ্যার কূহকে দেশের মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাতে চেষ্টা করেন। নতুন নতুন মিথ্যার উদ্‌ভাবন করে তিনি মানুষকে সহজ বাংলায় ধোঁকা দেবার অপচেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ স্যাঙ্গাৎ পুঁজিপতির চরম অনৈতিকতার বিস্তার সম্পর্কে তিনি স্বর্ণালী নীরবতা অবলম্বন করেছেন। একটি শব্দও উচ্চারণ করছেন না। তাঁর সরকারের অর্থমন্ত্রী তাঁরই নির্দেশে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা করেছেন। মোদীর কঠোর নির্দেশ ছাড়া ওই দক্ষিণী ভদ্রমহিলা যে কোনো টুঁ শব্দও করতে পারেন না তা বুঝতে অসুবিধা নেই।

অভিযুক্ত গৌতম আদানি হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট জানাজানি হবার পরেই একে ভারতের জাতীয় অস্মিতার ওপর আক্রমণ বলে উল্লেখ করেছিলেন। একজন পুঁজিমালিকের কতটা দুঃসাহস ও দেশের সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে এমন সব আজগুবি দাবি করে দেশের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা যায় তা, কল্পনার অতীত।

নরেন্দ্র মোদীর স্যাঙ্গাৎ গৌতম আদানি বর্তমান ভারতের জল স্থল অন্তরীক্ষ জুড়ে তার ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। কোথায় নেই আদানির বিপুল ব্যবসা! আদানি শুধুমাত্র ভারতেই নয়। মোদীর প্রত্যক্ষ মদতে তাঁর খনিজ পদার্থের ব্যবসা সুদূর অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবারের জন্য যখন অস্ট্রেলিয়া যান তখনই, মোদী সেই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীকে আদানির জন্য খনি অঞ্চল বরাত দিতে সুপারিশ করেছিলেন। ওই দেশের তৎকালীন দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী তাঁর সমগোত্রীয় নেতার কথা মেনে নিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য কুইন্সল্যান্ডের পরিবেশ কর্মীদের তুমুল প্রতিরোধ এবং আন্দোলনে প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় আদানি কয়লা উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি। এখন শুরু হয়েছে।

মোদী শুধুমাত্র ব্যবসার বরাতই পাইয়ে দেননি। তিনি অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফিরেই নাকি ভারতীয় স্টেট ব্যাংককে প্রচুর অর্থ মানে, হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ দেবার নির্দেশও দিয়েছিলেন। তাঁবেদার পুঁজিপতি বলে কথা! তার স্বার্থ ও মোদীর স্বার্থ এক ও অভিন্ন।

এখন আদানি সাম্রাজ্যের কয়লা ব্যবসা বিস্তৃত করতে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে জাহাজ ভর্তি কয়লা ওড়িশার সমুদ্রবন্দরে পৌঁছবে এবং সেখান থেকে সরাসরি চলে যাবে ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায়। দেশের অন্যতম বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বেসরকারিকরণ করে আদানির খপ্পরে। সেখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশে যাবে। এ নিয়ে তো পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক কৃষক আপত্তি জানিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। হাই-টেনশন তার জমির ওপর দিয়ে গেলে তা যে বিশেষ ক্ষতিকর এবং পরিবেশ ধ্বংসকারী। এই সমস্ত কৃষকরা তাই মনে করেন।

গৌতম আদানি বা আদানি সাম্রাজ্যে বর্তমানে কী নেই তার সুলুক সন্ধান করতে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন। জানা যায় আড়াই তিন দশককাল আগে গৌতম আদানি মুম্বাই শহরে এক অতি সাধারণ হীরা ব্যবসায়ী ছিল। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তারপর থেকেই আদানি সাম্রাজ্যের উত্থান। উল্কাগতিতে উত্থান। আর বছর ন'য়েক আগে সেই নরেন্দ্র মোদীই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে তো ''সবকা সাথ সবকা বিকাশ'' এর পরিবর্তে নির্দিষ্টভাবে ''আদানি আম্বানিকে সাথ— উনলোগো-কো বিকাশ''? আদানি ধরাকে সরা জ্ঞান করে সাম্রাজ্য বিস্তার করে গেল।

করবে না-ই বা কেন? ২০১৪ সালে মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্ব নিশ্চিত করতে কত পরিমাণে টাকা আদানি দিয়েছিল তা, জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সবাই জানে, মোদী প্রত্যেকদিন আহমেদাবাদ থেকে আদানির প্লেন-এ আসীন হয়ে ভারতের অসংখ্য প্রান্তে উড়ে যেতেন। প্রায় ৪৫০ টির মতো স্থানে মোদী দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গুজরাতে তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে নাকি অসাধারণ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে! সর্বৈব মিথ্যা। তিনি সবটাই করেছেন আদানির অকৃপণ বদান্যতায়। সুতরাং আদানির স্বার্থ রক্ষা এখন মোদীর বিশেষ কর্তব্য।

দুই

গৌতম আদানির বহুমুখী ব্যবসাগুলির মধ্যে যেমন খনিজ পদার্থ রয়েছে তেমনি, সমুদ্র বন্দর, সাত সাতটি এয়ারপোর্ট বা বিমানবন্দর। ইদানীং মোদীর সহায়তায় মুম্বাই বিমানবন্দরের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর আদানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যো কোম্পানিটি এই প্রায় ব্যস্ততম বিমান বন্দরের পরিচালনায় ছিল তার বিরুদ্ধে ইডি সিবিআই লেলিয়ে দিয়ে ভয় দেখিয়ে নাকি দেশ ছাড়া করেছে মোদী সরকার। মুম্বাই শহরের বহু একরের অতি মহার্ঘ জমি এখন আদানির কব্জায়।

সমুদ্রবন্দর অগণিত। গুজরাতের মুন্দ্রা এশিয়ার উল্লেখযোগ্য বড় সমুদ্রবন্দর। আদানির পরিকল্পনা— ভারতের সমুদ্রের দুই পাশে সমস্ত দিকে মণিমাণিক্য খচিত গলার হার বা মালার মতো সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করবে আদানি। ইতোমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের বদান্যতায় তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের বরাত আদানি গোষ্ঠী প্রায় পেয়ে গেছে। মোদী ঘনিষ্ঠ তাঁবেদার পুঁজিপতি অবশ্যই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জীরও অতি পছন্দের ব্যবসায়ী। এটা অবশ্য স্বাভাবিক। যেমন দেউচাপাচামিতে পরিবেশ ধ্বংসকারী কয়লা খনির জন্য বরাত সম্ভবত আদানিই পাচ্ছে।

আদানি গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ায় কয়লা খনি এবং ইজরায়েলে বন্দর ব্যবসা চালাচ্ছে। ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন এখন অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোদী জমানায় অতি দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি আদানির দখলে চলে যাচ্ছে। জনগণের অর্থে নির্মিত বহুমূল্যের এইসব শিল্পগুলি অনায়াসে চলে যাচ্ছে বিপুলাকার ভারতীয় বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের দখলে। এদের মধ্যে আদানির নাম সর্বাগ্রগণ্য। আদানি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পরিকাঠামো, অপ্রচলিত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি শক্তির ব্যবসায় যুক্ত। এসব ছাড়াও আদানি কোম্পানি ভোজ্য তেল এবং গ্রীন এনার্জির ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতির ব্যবসাও বৃহৎ আকারে করে চলেছে। বস্তুত ১৯৮৮ সালে গুজরাতের আহমেদাবাদে প্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানি উল্কাগতিতে শুধুমাত্র ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্বে অন্যতম প্রধান ধনকুবের বা শিল্পপতি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে, পুঁজিবাদের বিকাশের এই পর্যায়ে নানা ধরনের গোঁজামিল দেওয়া পুঁজিপতিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতের ও বহির্বিশ্বের বহু মানুষের অর্থ শেয়ার বাজার মারফৎ একত্রিত করে এইসব ব্যবসায়ীরা পুঁজি একত্রিত করে থাকে। শেয়ার বাজারে নানা গোঁজামিল চলেই থাকে। আর আদানির মতো ফাটকা পুঁজির কারাবারীরা নানাভাবে মানুষকে ঠকিয়ে তাদের মূলধন বাড়িয়ে তোলে। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের জীবন বীমা কর্পোরেশন বা স্টেট ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণে ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে লগ্নি করা। নিজেদের পারিবারিক অর্থে কেউই ব্যবসা করে না। সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায় যে, জীবনবীমা নিগম থেকে আদানি ঋণ নিয়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। স্টেট ব্যাংক থেকে প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও প্রায় সমস্ত পুঁজিপতিই অন্যের অর্থ ব্যবহারে দক্ষ। বহুক্ষেত্রেই ঋণ নেওয়া অর্থ আর ফেরৎ দেওয়াই হয় না। অনেক পুঁজি মালিকই ঋণের অর্থ লোপাট করে দিব্যি বিদেশে পালিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আবার প্রায় একশো শতাংশই আদানির মতোই গুজরাতবাসী। আদানি গোষ্ঠী এই ধরনের পথ ধরেই বর্তমান বিশ্বে বিপুল ধনরাশির মালিকদের মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছিল।

শেয়ার বাজারের হেরাফেরি খুব সংক্ষেপে বিবৃত করা বিষম বিষয়। দু'একটি উদাহরণ দিলেই সম্ভবত প্রাথমিক ধারণা করা সম্ভব। যেমন ধরা যাক, আদানির যেই শেয়ারের প্রকৃত দাম ৯৪৫-৯৪৭ টাকা তাই নানা শেল কোম্পানির নামে কেনাবেচা করে বা কৃত্রিম উপায়ে বাজার থেকে কিনে প্রতিটি শেয়ারের দাম ৪০০০ টাকা টাকা করা হয়েছে। এইভাবে আদায় করা বিপুল পরিমাণে টাকা আদানির পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত।

ভারতের প্রতিষ্ঠিত দুটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি বা SFIO এখনও বস্তুত নীরব। সম্ভবত এই দুটি সংস্থা সরকারি কর্তাদের প্রত্যক্ষ নির্দেশের অপেক্ষায় এত বড় একটি কেলেঙ্কারির বিষয়ে এখনও কোনো তদন্তই শুরু করেনি। পদক্ষেপ নেবার কোনো প্রশ্নই নেই। অর্থাৎ, মোদী জমানায় সংবিধান সম্মত সমস্ত সংস্থাগুলিই অকেজো হয়ে পড়েছে।

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট ঃ

সদ্য প্রকাশিত হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ভারতের আদানি গোষ্ঠী, বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় সর্বাপেক্ষা ধনী হিসেবে বিবেচিত এই গোষ্ঠী ব্যাপক কারচুপি করেছে। দুই বছরের বিস্তৃত গবেষণা করে তথ্য প্রমাণসহ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় ১৭.৪ ট্রিলিয়ন বা মার্কিন ডলারে ২১৮ বিলিয়ন ঠগবাজির প্রমাণ পেয়েছে নিউইয়র্কের এই গবেষণা সংস্থাটি। হিসেবের গরমিল হয়েছে ব্যাপক পরিমাণে। এমন জঘন্য হেরাফেরি একটি ভয়ঙ্কর অনৈতিকতার পরিচয় বহন করছে। বাজারে শেয়ার দরে নানা ধরনের গোঁজামিল দিয়ে এই বিপুলাকার গোষ্ঠীটি মানুষের সঙ্গে চূড়ান্ত প্রতারণা করেছে। বিশেষ করে যারা শেয়ার বাজারে লগ্নি করে তাদের এমন ফাঁপানো চিত্র প্রকাশ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ-এর অভিযোগ সম্পর্কে আদানি স্বয়ং এবং গোষ্ঠীর আর্থিক বিষয়ে প্রধান কর্তা কি বলেছেন তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদের কপট আশ্রয় নিয়ে এই গোষ্ঠীটি সত্য গোপন করে বাঁচতে চাইছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক এভাবেই উগ্র জাতীয়তাবাদের ডঙ্কা বাজিয়ে নিজের অপরাধ গোপন করার অপচেষ্টা করে থাকেন। প্রতিবাদের এই ধরনটি ভারতের সচেতন নাগরিকদের কাছে অভিনব কিছু নয়। অতি ঘনিষ্ঠ পুঁজিমালিককে বাঁচানোর জন্য নিশ্চিতই এমন উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের স্বনির্ভরতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করতে পরামর্শ দিয়েছেন মোদী স্বয়ং।

এই ব্যাপক দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হবার পর থেকে আজ (৮.২.২৩) পর্যন্ত ভারতের সংসদে মোদী কোনো বিবৃতি দেন নি। তাঁর চ্যালাচামুন্ডারা শিবা রব করে মোদীর ভাবমূর্তি রক্ষার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক গৌতম আদানি প্রাথমিক বিহ্বলতার বশবর্তী হয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে FPO বা Follow on Public Office প্রত্যাহার করে নিচ্ছে তার গোষ্ঠী। পরবর্তীকালে সম্ভবত মোদীর পরামর্শেই গৌতম আদানি অন্যভাবে এত বড় কেলেঙ্কারির দায় ঝেড়ে ফেলার অপচেষ্টা করে চলেছে।

আদানি কোম্পানি মরিশাস প্রভৃতি অতি নরম করব্যবস্থার স্বর্গরাজ্য থেকে দু-নম্বরি উপায়ে শেয়ার বাজারে তঞ্চকতার খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন অবশ্য অনেক পুঁজিপতিই করে থাকে। গৌতম আদানির এক ভাই বিনোদ আদানি আরব দেশে (দুবাই) বসবাস করে নাকি এ ধরনের অনৈতিক কাজ নির্বিঘ্নে করে চলেছে।

দুর্নীতি রোধে মোদীর উদ্ধত উচ্চারণ ছিল ''না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা!'' এখন তো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, মোদী স্বয়ং অনেক

এরপর ৬-এর পাতায়

কমরেড সৌরীন ভট্টাচার্য—স্মারক বক্তৃতা

গত ৩০ জানুয়ারি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ইন্দুমতী সভাগৃহে অধ্যাপক কম. সৌরীন ভট্টাচার্য স্মরণ কমিটি আহুত একটি সুশৃঙ্খল সভায় আর এস পি'র প্রাক্তন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৌরীন ভট্টাচার্যর স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল ইতিহাসের বিকৃতি—রাষ্ট্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক—এ প্রজন্মের অনেকেই অধ্যাপক কমরেড সৌরীন ভট্টাচার্যের নামের সাথে ঠিক সেভাবে পরিচিত হয়তো নয়। কিন্তু আজকের এই কঠিন সময়ে, দক্ষিণপন্থার প্রবল আক্রমণে যখন আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীতে তার করাল থাবা বসাচ্ছে তখন এই মানুষদের জীবনচর্যাকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরো বেশি বেশি চর্চায় আনা প্রয়োজন।

সৌরীন ভট্টাচার্য তাঁর জীবনের প্রথম ১৩ বছর বাদ দিয়ে সমগ্র জীবন (৭০ বছর) লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন। প্রথমে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইকে তীব্রতর করতে জেল খেটেছেন, রাস্তায় থেকেছেন এবং মানবতাবিরোধী ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হত্যাকারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রণী সৈনিক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই স্মরণ কমিটি তাঁর জন্মবার্ষিকীতে এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে তাঁর স্মৃতি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছিল।

এই সভাগৃহে উপচে পড়া মানুষের ভিড়ে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. তুষার চক্রবর্তী বলেন যে সৌরীনবাবু এমন একটা সময়ের মানুষ যেখানে আমাদের দেশের একটা প্রজন্ম তাঁদের জীবন, মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের একটা অংশ, মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্রতর করেছিলেন। সৌরীন ভট্টাচার্য তাঁদেরই অন্যতম। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৌরীন ভট্টাচার্য এক অর্থে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক আন্দোলনের পথিকৃৎসম ছিলেন। এছাড়া '৭১'র বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে সংসদে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আজকের দিনে তাঁর মতন মানুষের গুরুত্ব অপরিসীম।

তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। আজকের দিনে শাসক শ্রেণি তার স্বার্থে যেভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছে তা অত্যন্ত দুর্ভাবনার। সেই অবস্থা রুখতে স্মরণ কমিটি এধরনের স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছে তা, নতুন প্রজন্ম সহ সকলের জন্য অত্যন্ত জরুরি আলোচনা।

অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যর আলোচনার মুখবন্ধ করতে গিয়ে আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, যে অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যের ৯৭তম জন্মদিবসে এই স্মারক বক্তৃতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে শাসকশ্রেণি যেভাবে সর্বত্র ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছে, তা ভয়ংকর। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাসের বিকৃতি সবৈব নতুন নয়। অতীতেও হয়েছে। এরাজ্যেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসার প্রসার ঘটাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার একইসঙ্গে হিন্দি বলয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার ও প্রসারে মনোযোগী। বিগত ৭ বছরে এই বিষ ব্যাপ্ত হয়েছে। প্রতিনিয়ত হিন্দি, হিন্দু ও হিন্দুস্তান নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়নে সংঘ পরিবার উদগ্রীব। দেশের ইতিহাস প্রতিনিয়ত বিকৃত করা এটা যেমন আমরা দেখছি, তেমনই দেখছি স্কুল শিক্ষার পাঠক্রম পর্যন্ত পাল্টে ফেলা হচ্ছে। অতীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজরাজড়া বা জমিদারদের জীবনী সম্বলিত ইতিহাস পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে এ রাজ্যের শাসক দলের কোনো বিরোধিতা নেই। কারণ এটা পরিষ্কার যে, এরা একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। পশ্চিমবঙ্গেও স্কুল পাঠক্রমে এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশিত করা হচ্ছে যার সঙ্গে বাস্তব ইতিহাস চর্চার সম্পর্ক নেই। কিছু পেটোয়া ইতিহাসের অধ্যাপককে ওরা ক্ষমতার জোরে ব্যবহার করছে। বিজেপির সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্র শাসকদলের এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। এই কঠিন সময়ে তাই সৌরীন ভট্টাচার্য স্মরণ কমিটির এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সময়ে এই অবস্থার মোকাবিলা বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবেই করতে হবে।

স্মারক বক্তৃতার মুখ্য আলোচক অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত বলেন—তাঁর আলোচনার শুরুতে প্রথমেই বলেন বিশ্বাসকে ইতিহাসে পরিণত করছে রাষ্ট্রশক্তি। এই বিকৃতি নতুন কোনো ঘটনা নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও এদেশের মানুষকে সব সত্য পরিবেশন করেনি। এমনকি, স্বাধীনোত্তর কালেও পাঠ্যপুস্তকে সব সত্য পরিবেশিত হয়নি। ফলে বলা যায় দীর্ঘসময়ব্যাপী ভারত রাষ্ট্রে ইতিহাসের পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। বিদ্যালয় স্তর থেকেই ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আর বর্তমানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দীর্ঘকাল ধরে একাগ্রতার সঙ্গে এমন অপকর্ম চালাচ্ছে। তাঁর পরামর্শ এর প্রতিরোধে নরম হিন্দুত্বের পথ ছেড়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রচার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের বোধযোগ্য ভাষায় প্রকৃত ইতিহাস চর্চায় যেমন মন দিতে হবে, তেমনিই বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই অবস্থার মোকাবিলা করতে প্রস্তুতি নিতে হবে। এই স্মারক বক্তৃতার শুরুতে অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যের উপর একটি ছোট্ট তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। সেখানে বলেছেন কম. মনোজ ভট্টাচার্য, কম. বিমান বসু, কম. দেবাশীষ মুখার্জী ও কম. অধ্যাপক ড. তুষার চক্রবর্তী। কম. নওফেল মহ. সফিউল্লা ও কম. বহ্নিশিখা মৈত্রর যৌথ পরিচালনায় এটি পরিবেশিত হয়। সমবেত দর্শক ও শ্রোতাদের অত্যন্ত প্রশংসা লাভ করেছে। বিহঙ্গম নাট্য গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে হৃদয়গ্রাহী গণসংগীত পরিবেশিত হয়। এই সভায় অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যের উপর একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। বইটি উন্মোচন করেন অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত।

কমরেড শক্তি ভট্টাচার্য লাল সেলাম

আজ বিকেলে আর এস পি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সম্পাদক কম. শক্তি ভট্টাচার্য কলকাতায় বি এম বিড়লা হাসপাতালে আজ বিকেল ৪.৩০ টায় প্রয়াত হন। আজ সকালে ১০টা নাগাদ হঠাৎই বুকে ব্যথা অনুভব করার পরে পরেই তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে মেদিনীপুর শহরের কেটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে কম. ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থা দেখে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার সুপারিশ করেন। অতঃপর তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে কলকাতার বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারে ভর্তি করেন।

ওই দিনই বিকেল ৪.৩০টার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কম. শক্তি ভট্টাচার্য মেদিনীপুর শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। কম. ভট্টাচার্য অনুশীলন সমিতির সদস্য মেদিনীপুর চার্চ স্কুলের শিক্ষক তথা তদানীন্তন আর এস পি মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক জনমানসে অতীব শ্রদ্ধেয় কম. বিবেক বোসের সাথে তাঁর বাবার মাধ্যমে পরিচিত হন। তারপর ধীরে ধীরে আর এস পি'র সাথে যুক্ত হন। আর এস পি-তে যোগদানের কিছুকাল পরে তিনি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন। ১৯৮৩ সালে আর এস পি-র সদস্য পদ লাভ করেন। প্রথমদিকে তিনি মেদিনীপুর শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে কম. শক্তি ভট্টাচার্য অবিভক্ত মেদিনীপুরের জেলা কমিটির সদস্য এবং জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। মেদিনীপুর জেলা ভাগ হওয়ার পরে তিনি আর এস পি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি দলের জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। কম. ভট্টাচার্য নিতান্ত সাদামাটাভাবে জীবনযাপন করতেন। দলের সর্বস্তরের কর্মীদের কাছে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়ও ছিলেন।

কমরেড শক্তি ভট্টাচার্য'র মরদেহ দলের রাজ্য দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। তাঁর পরিবারের উপস্থিত সবাই মনে করেছিলেন যে, প্রয়াত মানুষটির অতি প্রিয় ছিল তাঁর রাজনৈতিক দল আর এস পি। মূলত সে কারণেই তাঁরা প্রয়াত নেতার মরদেহ দলের রাজ্য দপ্তরে নিয়ে আসেন। সেই সময় পার্টি অফিসে উপস্থিত ছিলেন আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কম. অশোক ঘোষ, কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কম. দেবাশীষ মুখার্জী, মহিলা আন্দোলনের নেত্রী কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কম. পুলক মৈত্র, রাজ্য কমিটির সদস্য কম. স্বপন মেইকাপ সহ আরও অনেকে। কম. শক্তি ভট্টাচার্যর মরদেহে দলের রক্তপতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কম. মনোজ ভট্টাচার্য।

আজকের এই সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোদের অবক্ষয়ের সময়ে কম. ভট্টাচার্যের ন্যায় বিপ্লবী সমাজবাদী আদর্শের প্রতি অবিচল একজন সাথীর আকস্মিক প্রয়াণ খুবই বেদনার। আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কম. শক্তি ভট্টাচার্যের অমলিন স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। কম. ভট্টাচার্যের স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোদী সরকারের পতন সম্ভব করতে হবে

১-এর পাতার পর—

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীর সংকট বারংবার মুখব্যাদান করছে। সেই সুদূর ২০০৮ সালে যে সংকট প্রকাশ্যে এসেছিল তা থেকে মুক্তির সমস্ত পথসন্ধানই কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ কোনও পথ খুঁজে পায়নি। দীর্ঘস্থায়ী মন্দা ও মূল্যস্ফীতি অগণিত দেশের সাধারণ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। এমন অবস্থা ১৯২৯-৩৯-এর মহামন্দা কালেও অনুভূত হয়নি। সকলেই জানেন যে সেই মহামন্দার পরিণতিতেই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ এবং কয়েক কোটি মানুষের নিষ্ঠুর হত্যা। এমন এক নিরাপত্তাহীন অর্থনৈতিক সমস্যাকালেই এশিয়া মহাদেশের তুরস্ক এবং সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূকম্প। শুধুমাত্র তুরস্কেই কমপক্ষে ৩৭ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। এখনও নিত্যনতুন মরদেহ আবিষ্কৃত হচ্ছে। এক আতঙ্কজনক অবস্থা চলছে এই ভূখণ্ডে। ভূগর্ভের প্লেট সরে যাবার জন্যই এমন ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প বলে ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন। আবার মনে হয়, বর্তমান সময়ে যে উদ্ভট কায়দায় প্রকৃতি ও পরিবেশ বিনাশী উন্নয়নের ছক অনুসৃত হচ্ছে তার জন্যও এমন অবস্থা কিনা তা, নিশ্চিত করে বলা যায় না। ভারতে যোশীমঠ প্রভৃতি হিমালয় বা হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে বহু জনপদে যেভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে তার পিছনেও তো নয়াউদারবাদী উন্নয়নের অভিশাপই দায়ী। যোশীমঠ প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণে হিমালয়ের মতো নবীন পর্বতমালার বুক ভেদ করে যেভাবে "চারধাম" নামের প্রশস্ত পথ নির্মাণ করা হচ্ছে বা হয়েছে তা যে, কত মানুষের জীবন বিপন্ন করবে জানা নেই। পুঁজিবাদী উন্নয়নের এই ছকটিকেই সর্বত্র চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

প্রসঙ্গ বিরোধী রাজনীতি

আজকের ভারতে বিরোধী রাজনীতি প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। শাসকদলের এই অগ্রগতিতে বিরোধী দলের অবদান কিছু কম নয়। নরেন্দ্র মোদীর 'আদিবাসী' রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করার বিরোধী ঐক্য প্রায় ছত্রখান হয়ে পড়ল। বিরোধীরা প্রাক্তন বিজেপি নেতা যশোবন্ত সিনহাকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীরা একজোট হতে ব্যর্থ হল, তৃণমূল কংগ্রেস তো নির্বাচনে অংশগ্রহণই করল না। অতএব আগামী ২৪-এর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সহজেই সংশয়াচ্ছন্ন।

বিরোধী রাজনীতির এই দুর্বলতার শেকড় কোথায়? আসলে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হলে যে নৈতিক আদর্শ, মূল্যবোধ, রাজনৈতিক সংহতি দরকার, তার কোনো বহিঃপ্রকাশ ফ্যাসিবাদী বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নিদারুণভাবেই অনুপস্থিত। এরা ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার ভাবনা করছে না। এই সুযোগটা ৫৬ ইঞ্চির ছাতিওয়ালা বিজেপি বর্তমান প্রাণপুরুষ তো গ্রহণ করবেই। তাছাড়া টাকার জোরে সাংসদ বা বিধায়ক কেনাবেচা ভারতের রাজনীতির অঙ্গ হয়ে ওঠায়। টাকার জোরে যার বেশি, জয় তারই হবে এমন কথা সম্ভবত নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সদ্য অতীতে সংগঠিত কৃষি আইন বিরোধী আন্দোলন বা সি এ এস-এন আর সি- সি এ এ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য প্রমাণ করে সংসদীয় দলগুলির আওতার বাইরে থেকেও শাসকদল বিরোধী আন্দোলনে জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব।

সংসদীয় বিরোধী দলগুলির বিজেপি বিরোধিতা শুধুমাত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা নয়। বিরোধী রাজনীতির এমন দুঃখজনক অবস্থাও ভারতের মাটিতে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করছে।

ইতিহাসের বিকৃতি—সংঘ পরিবারের তত্ত্বে

পার্থসারথি দাশগুপ্ত

বর্তমান শাসকদল সাধারণ মানুষের কাছে যেভাবে দেশাত্মবোধ এবং ভারতীয় জাতিসত্তার ধারণা পৌঁছে দিচ্ছে, তার মূল প্রকল্পটার কাঠামোটাই তৈরি হয়েছে ইতিহাসের বিকৃতির ওপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে আর এস এস এবং ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অজস্র দক্ষিণপন্থী হিন্দু সংগঠন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সমগ্র সমাজের মধ্যে দেশের মধ্যযুগের ইতিহাসকে এমন বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করছে—যাতে দেশের প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

ইতিহাসের বিকৃতি প্রধানত বাস্তব জীবনের ভিত্তিগুলিকে অস্পষ্ট করে। বলা চলে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রচলিত লোককথা কাব্য অথবা কল্পকাহিনী বা মিথকে সর্বদাই অতীতে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শাসক গোষ্ঠী শ্রেণি শোষণের স্বার্থে ইতিহাস হিসেবে প্রচার করেছে। জনগণকে বুঝিয়েছে তাদের মধ্যে সম্মতি নির্মাণ করেছে। বুঝিয়েছে তারা যে, শোষণ ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে তা চিরস্থায়ী, তার কোনো বিকল্প নেই। সেই শাসন, সেই শাসকের প্রচারিত সমাজনীতি ও সাংস্কৃতিক চেতনাকেই শাসকশ্রেণি তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করেছে।

গত শতাব্দীতে বিশ্ববাসী দু দুটি বিশ্বযুদ্ধ, চরম পুঁজিবাদী সংকট, সমাজের চূড়ান্ত ভাঙাগড়া ও সামাজিক অবক্ষয়ের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে, গণতন্ত্রের সামান্যতম অবশেষটাও নিশ্চিহ্ন করে ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদ ইতিহাসের বাস্তবভিত্তিটাকে আমূল উপড়ে দেয়। অপবিজ্ঞান, জাতিবর্ণ সম্প্রদায়গত বৈচিত্রের বিভিন্নতাকে পরস্পর পরস্পরের সংঘাতমূলক সম্পর্ক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটাকে তছনছ করে সংঘ পরিবার দেশের একগোষ্ঠীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমগ্র সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনে, অজস্র কৌশলে সেই বিকৃত ইতিহাস, সেইসব মিথকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার দুরভিসন্ধি নিয়ে এগোচ্ছে।

সংঘ পরিবারের ইতিহাস বিকৃতি এবং জাতীয়তাবাদের ধারণা ঔপনিবেশিক শাসকদের ভারতেতিহাসের অনুসারী

উপনিবেশ জুড়ে পুঁজির সঞ্চয়ন, বাণিজ্যিক পুঁজিকে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরের স্বার্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থাকে প্রশাসনিক তথা বিস্তৃত বাজারব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বার্থে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালেই এতদঞ্চলের ইতিহাসের বিকৃতি শুরু হয়। ঔপনিবেশিক স্বার্থ প্রণোদিত শিক্ষাবিদরা একদিকে যেমন ইংরেজি শিক্ষা ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার, অপরদিকে তেমন পূর্ববর্তীযুগের শাসকদের ইতিহাসকে বিকৃত করে মধ্যযুগের ইতিহাসকে মুসলমান অধ্যুষিত যুগ বলে ইতিহাস রচনা শুরু করে।

আর সংঘ পরিবার তথা বর্তমান শাসকদল বিজেপি তাদের অজস্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঔপনিবেশিক যুগের ইউরোপীয় ইতিহাসকার, ভাষাতাত্ত্বিক এবং প্রশাসনিক এলিটদের কাছ থেকেই, সংঘ পরিবারের বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবাদ, আত্ম নির্ভর ভারত, এক দেশ-এক জাতি এক-ভাষার তত্ত্ব আহরণ করেছে। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের দ্বারা নির্মিত এই ধরনের ইতিহাস ব্যাখ্যার সার্থক উত্তরসূরি সংঘ পরিবার এই ধরনের ভাবনা চিন্তা দেশের ব্যাপক মানুষের চেতনায় গেঁথে দিতে পারছে। তাই বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস সহ সামগ্রিক জ্ঞানচর্চার পথ রুদ্ধ করে সংঘ পরিবার ও বিজেপি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশবাসীকে ভুলিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে এই বিশাল ভূখণ্ডে বহু ধরনের ধর্ম সম্প্রদায়, জাতপাত, গোষ্ঠী এমনকি ছোট ছোট এলাকাজুড়ে আদিম সামবায়িক তথা প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বহুত্ববাদী সত্তার অস্তিত্ব ছিল। এমনকি, যে রামায়ণ মহাভারত বা হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাকে সংঘ পরিবার অস্ত্র রূপে ব্যবহার করছে—সারা দেশে অঞ্চলভেদে তা বিচিত্র ধরনের বহুত্ববিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

প্রাচীন মহাকাব্য এবং সাহিত্যের নায়ক নায়িকারাও অঞ্চলভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করেছিলেন। একই রাম বা শ্রীকৃষ্ণ বা সীতা কিংবা রাবণ পাণ্ডব ভ্রাতাগণ বিভিন্ন ধরনের আন্তঃসম্পর্কের প্রেক্ষিতে ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আলোকে অঞ্চলে অঞ্চলে এবং ভারতের বাইরেও উপস্থাপিত হয়েছে।

এই ধরনের বিকৃত ইতিহাসভিত্তিক সম্মতির বিকল্পে সংঘ পরিবারের তথাকথিত হিন্দু ভারতের একশৈলিক রূপকল্পনার অসদুদ্দেশ্য অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদ নির্ভর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নির্ভর ইতিহাসের ব্যাপক প্রচারের দায়বদ্ধতা নিতে হবে দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন দল গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের।

মনে রাখতে হবে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা বাজারব্যবস্থার প্রসার ও বাণিজ্যিক মূলধনের শিল্পপুঁজিতে মৌলিক রূপান্তরের স্বার্থে প্রথম ভারতীয় আধুনিক ইতিহাসের রচনাকার জেমস মিল, 'দি হিস্টরি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' রচনা করে ১৮১৮-১৮২০ সালের মধ্যে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিস্তারের কালেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর ইংল্যান্ডের হেজিমনি পাকাপাকি হবার আগেই জেমস মিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার বিকৃত সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে জেমস মিলের হাত থেকে এই 'অপকীর্তির' দায়িত্বের ব্যাটন তুলে নেন ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ ইতিহাসকারের দল। বিশাল ভূখণ্ডে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া সত্ত্বেও অজস্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সামন্তবাদী শাসনের উপর আধিপত্য কব্জা করা বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন এবং জমির ওপর পুঁজিবাদী উদ্বৃত্তমূল্য শোষণ ধর্মী রাজস্ব কাঠামো, কাঁচামাল রপ্তানির স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের কর প্রচলন, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ও অনুশীলন পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের কালে জেমস মিল-ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ ইতিহাসকার, ম্যাক্সমুলারের মতো ভারততত্ত্ববিদ ও ভাষাবিদরা দেশের জায়মান উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতি-সমাজনীতির উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলল। আবার এই সব নতুন ভারত আবিষ্কারমুখী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন চিন্তা চেতনা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকল। প্রথমত, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের নির্মিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও প্রশাসনিক সম্প্রদায়ভুক্ত পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় শাসনকাল হিসাবে পর্যায়ভুক্ত করা হল। ধর্মীয় পরিসরে হিন্দুসভ্যতার শাসন, মাঝে ইসলামিক সভ্যতা এবং সবশেষে ইংরেজদের সভ্যতা নির্ভর শাসন। এঁরা ভারতের ইতিহাসকে দুটি পৃথক জাতীয়তাবাদের খোপে বন্দি করলেন, হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামিক জাতীয়তাবাদ আর মধ্যযুগে ইউরোপের সুদীর্ঘকাল ক্রুসেড-জাত ধর্মীয় জেহাদ জনিত ইসলামবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুসলমান শাসকদের এক ঢালা ছাঁচে নিষ্ঠুর বর্বর লোভী ইত্যাদি ধূসর ও কালো রঙে চিহ্নিত।

দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক এলিটদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভারতবর্ষও একটি পশ্চাৎপদ উৎপাদন ও অশিক্ষিত বর্বর দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত দেশ। সুসভ্য শ্বেতবর্ণীয় ইউরোপীয়ান, প্রধানত ইংরেজদের দায় এই দেশকে সভ্য করা এবং খণ্ড খণ্ড অঞ্চলগুলিকে একই প্রশাসনের আধিপত্যে অর্থাৎ এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা।

মুসলমান শাসক এবং তাঁদের শাসনকাল সম্বন্ধে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের উপনিবেশবাদ নির্ভর এই মনোভাবই সংঘ পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির বীজমন্ত্র। ইংরেজ বা ইউরোপীয় জাতিসত্তার সঙ্গে ফ্যাসিবাদী তত্ত্বের শুদ্ধ উন্নত জিন বা রক্তবাহিত বংশধারার পূর্বসুরী সংঘ প্রচারবাদের তথাকথিত আদি অনাদিবাসী (অবৈজ্ঞানিক) আর্য রক্তের নাকি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই ইউরোপের বিভিন্ন জাতির প্রতি যথেষ্ট নরম মনোভাব পোষণ করে সংঘের তাত্ত্বিক এবং তাদের অনুসারি দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। এভাবেই ইউরোপীয়নরা ভারতে বহিরাগত হলেও মুসলমানদের সংঘর্ষপ্রবণ হিংস্র উগ্র এবং আগ্রাসনকারী বহিরাগত সাম্প্রদায়িক জাতিসত্তা বিশিষ্ট বিদেশি জাতি বলে ঘৃণা উগরে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে সংঘপরিবার খ্রিস্টানদেরও বহিরাগত বলে ব্যাখ্যা করে। অহিন্দুদের এক সারিতে ফেলে সাম্প্রতিককালে খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচারের মাত্রাও বাড়িয়েছে। ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদির বাহানায়। আবার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে এদের প্রতি একটু নরম ভাবও দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রচলিত বৈদেশিক রাজনীতি-অর্থনীতির চাপ অবশ্যই কিছুটা রয়েছে শাসকদল বিজেপির ওপর। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্বেষের বীজ অনুপ্রবেশ করিয়েছিল ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক এবং আমলাকুল দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষ। এর ফলশ্রুতিতে যে একাংশ হিন্দু রাজারাজড়াকুল মধ্যযুগে এবং পরে ঔপনিবেশিক যুগে মুসলমান রাজা বা সামন্তশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তাদের লড়াইকে মুসলিম শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বাধীনতার লড়াই হিসেবে ছাপ মেরে দেওয়া হয়। অন্যদিকে মুসলমান জাতিসত্তার মৌলবাদী সমর্থক মুসলমান জাতীয়তাবাদীরাও এই ইতিহাসকে হিন্দুবিরোধী দৃষ্টিকোণে কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলে। এই পরস্পর বিরোধী ছদ্মজাতীয়তাবাদের দায় শুধু দেশভাগের মূল্যেই বোঝাতে হয়নি। আজও তার বিষাক্ত উপাদানগুলিকে ভারত ও পাকিস্তান বহন করে চলেছে।

অথচ ইতিহাসের এই বিকৃতি এদেশের সমাজমানসে এমনভাবে গেড়ে দেওয়া হয়েছে মুসলমান শাসকরা এদেশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অনেক আগে থেকেই ইসলামিক সভ্যতা বিভিন্ন রূপে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক পরিসরে শুধু নয়, বিভিন্ন ছোট ছোট স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর মাধ্যমে উদাত্তপাঠ ধর্মীয় পরিসরে এদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুফি সাধকদের সাহিত্য, তুর্কী, আফগান, পারসিকদের শিল্প এবং প্রযুক্তিগত শৈলী, বিভিন্ন দেশের মুসলমান বণিকী লেনদেন এবং যোদ্ধাদের যুদ্ধকৌশল ইত্যাদি বহুরূপ সমন্বিত ভাষা-সাহিত্য-যুদ্ধকৌশল-শিল্প ইত্যাদি এদেশের সভ্যতাসংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েই এদেশের মুসলমান জনবসতি অন্যান্য ধর্মীয় সত্তার সঙ্গে একত্রে প্রসারিত হয়েছিল। বলা চলে বিকাশমান হয়েছিল।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা যেভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও অর্থনীতিকে স্থবির চেহারায় চিত্রিত করেছিল, তা বাস্তবসম্মত নয়। কৃষি এবং শিল্পের বহুবিধ আঞ্চলিক ধরনসহই ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল।

বিজ্ঞানভিত্তিক ভারতীয় ইতিহাস চর্চাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ব্রিটিস ঐতিহাসিক ও আমলাগোষ্ঠী ভারতীয় উঠতি মধ্যবিত্তের মস্তিষ্কের ব্রিটিশ ভারতীয় জনগণনা প্রসূত সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধারণা অনুপ্রবেশ করায়। ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক জনগণনা হিন্দু ও মুসলমানদের অজস্র উপগোষ্ঠী, শৈব বৈষ্ণব শাক্ত সহজিয়া সুফি আউলবাউল শক হুন আফগান যাযাবর গোষ্ঠীদের দুটি পরস্পর বিরোধী চেম্বারে, সমস্ত বহুত্ববাদকে ধ্বংস করে দুটি জাতিসত্তার চেহারায় ঠেসে ঢুকিয়ে দেয়।

এই সমস্ত বিকৃত ঐতিহাসিক উপাদান ছাড়াও, ইউরোপে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন উগ্র আধিপত্যমূলক জাতিরাষ্ট্রের তত্ত্বে তথাকথিত শুদ্ধ মানবজাতির তত্ত্ব সংঘ পরিবার পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে। উন্নত মানবপ্রজাতির অপবিজ্ঞান ও অবক্ষয়িত ইতিহাসের জন্ম ঔপনিবেশিক যুগের উন্নত আর্যপ্রজাতির তত্ত্বে। এই জটিল তত্ত্বে ইউরোপের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের মৌলিক সম্পর্ক আবিষ্কারের মাধ্যমে আর্যসভ্যতার উগ্রগরিমাকে রাষ্ট্রিক শুধু নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতিগত গবেষণারও অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

(চলবে)

সংকটের যাঁতাকলে

সংকট চতুর্দিকে। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে সর্বত্র। সংকট নিরসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়সমূহ আরও বেশি সংকটময় করে তার জটিলতা সৃষ্টি করে পঙ্কে নিমজ্জিত করার চেষ্টায় রত। দুর্নীতি, অনিয়ম, কারচুপি এই কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা গা ছমছম করার ব্যাপার রয়েছে। বেশ রোমাঞ্চকর বিষয়, ফিসফিস, আড়িপাতা, কেউ যেন দেখে না ফেলে, বুঝে না নেয় কি হয়েছে বা কি হতে চলেছে, সকলের বোধগম্য হয়ে গেলে, সেই রোমাঞ্চ যেন উধাও হয়ে যায়। তবুও সমাজের অমোঘ নিয়মে সেই বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে প্রকাশ্যে। এ যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা যেটা অবশ্যই কোনো না কোনো দিন প্রকাশ পাবেই। পশ্চিমবঙ্গে এখন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে উত্তাল। সেটা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। আবাস যোজনায় যে সকল গরিব মানুষের ঘর পাওয়ার কথা ছিল, তারা তা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং যারা পাওয়ার কথা নয়, তারা তা পাওয়ার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এবং এই বিবেচনার পিছনে নানা ধরনের দুর্নীতি জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকারে আসীন যে দল, তার সমর্থিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়ে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। শুধুমাত্র তাদের অনুসারীদের একটা অংশ এই একই দুর্নীতির সাথে যুক্ত বলেই নয়, সময়মত যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, তারা সেটা করতে অক্ষম হয়েছে বা বাস্তবে তাদের অনীহা ছিল। বিষয়টি বছরের পর বছর ধরে চলছে, অথচ এই ব্যাপক দুর্নীতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধ্যানধারণা ছিল না, এমনভাবেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসছে। আসল কথা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমতে জমতে সেটা যখন বিস্ফোরণের আকার ধারণ করেছে তখন, সেই বিস্ফোরণ যাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেখান থেকে একই শ্রেণিভুক্ত দল কিছুটা সুফল পেতে পারে তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

আবারও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় আসীন দল ও রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন দল একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।

অপর একটি বিষয়ও পশ্চিমবঙ্গে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সেটা হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুলায়তন দুর্নীতি রাজ্যকে খুব বড় প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। এই একটি বিষয়ের জাল এতটাই বিস্তৃত, যার কূলকিনারা পাওয়া দুষ্কর বললেও কম বলা হবে। সরকারী নানাবিধ কাজেই দুর্নীতি জড়িয়ে রয়েছে এমনটাই লক্ষ করা যায়। মানুষ এবিষয়ে ওয়াকিবহাল। এক দুই তিনজনের বিষয় নয়, হাজার হাজার এইরকম উদাহরণ রাজ্য ও দেশজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যা কিছু অন্যায় ঘটে চলেছে, তার ব্যাপ্তি বিশাল হলেও এবং ঘটনার বিবরণ কোনদিন কোনো কারণে প্রকাশ্যে আসলেও ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে হেলদোল সেভাবে লক্ষণীয় নয়। এমনকি, একটা প্রশ্রয়ের হাত যেন তাদের মাথার ওপর রয়েছে —এমনটাই মনে হয়।

ব্যাপক অংশের জনসাধারণের এত বিষয় নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই, কারণ দৈনন্দিন জীবনের নানা ধরনের চাহিদা মেটাতে অপারগতা তাকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। তার মধ্যেও যেটুকু অংশ কিছুটা চিন্তাভাবনা করে তারাও এই দুর্নীতিকে সহজভাবে গ্রহণ করছে এবং স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে। কারণ এর বৈপরীত্য এতটাই নগণ্য যে, এমন কোনো উদাহরণ নজরে আসে না এবং বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। বরং মানুষের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে, রাজনৈতিক ভাবে যুক্ত ব্যক্তি দুর্নীতির সাথে অবশ্যই যুক্ত থাকবে। ফলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো সংগঠিত শক্তি গড়ে উঠছে না। এছাড়াও, এক শ্রেণির মানুষ ন্যূনতম অর্থ বা সামগ্রীর বিনিময়ে নিজের মেরুদণ্ড সোজা রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। ঠিক এই বিষয়টিকেই কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্য সরকার খুব সচেতন ও সুচতুরভাবে কাজে লাগিয়ে চলেছে। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই, এই সংকট সমাজের বুকে ভয়াবহ হিসেবে ধেয়ে আসছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য যেরকম লক্ষ করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা এতটাই বিস্তৃত হয়েছে এবং সেখানে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত মনোভাবে নিজের অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিমাপ না করেই, তথাকথিত সুখের আবেশে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে, নানারকম সম্পদ অর্জনের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে একের পর এক অর্থ ধার নিয়ে চলেছে। সেই অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো মানুষের এই চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে সাধারণ মানুষকে জর্জরিত করে চলেছে। এমনকি একটি ধার শোধ করতে আরেকটি ধার, তারপর আরেকটি, এইভাবে নাজেহাল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে নিজের জীবনহানি করার মতো ঘটনা ঘটাতে বাধ্য হচ্ছে। এই সংখ্যাটা কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ হিসেবে মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে এটা কি ঠিক যে, রাষ্ট্র এবিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। আসলে রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের চেতনার সঠিক বিকাশ ঘটাতে ইচ্ছুক নয়। কারণ, তাতে তাদের শ্রেণিমিত্রদের স্বার্থে আঘাত নেমে আসবে।

খুব কঠিন হলেও মানুষকেই তার জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করার পথ খুঁজে বের করার পদ্ধতি আয়ত্ত করে, বিভিন্ন ধরনের সংকটের যাঁতাকল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

—ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য

আদানির প্রতারণা কি মোদীর শেষের শুরু

৩-এর পাতার পর—

উচ্চমানের খেলোয়াড়। তাঁর ব্যাপক দুর্নীতির সঙ্গে গভীর সংশ্রব সাধারণভাবে দেশের মানুষ কল্পনা করতেও পারবেন না। নেহাতই বিদেশের একটি কোম্পানি বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের অশুভ অনৈতিক কাণ্ড কারখানা নিয়ে গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তথ্য প্রমাণ প্রকাশ্যে পেশ করে দিয়েছে। তার ফলেই দেশ জানতে পারছে, মোদী কত গভীর দুর্নীতিবাজ এক তঞ্চক ও দুর্বৃত্তসম রাজনীতিক। বাস্তবে সকলেই জানেন যে, মোদী নেতৃত্বে বেশ কিছুকাল যাবৎই 'পি এম কেয়ার্স' নামে একটি বিপুল ধনরাশি একত্রিত করার ফন্দি আঁটা হয়েছে। এই সংস্থাটি দেশের সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে চলে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরই এর পরিচালক। কিন্তু এই বিষয়ে সংসদে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। কোনো আলোচনাই করা যাবে না! তথ্যের অধিকার আইনেও এ প্রসঙ্গে কোনো উত্তর দেওয়া হবে না। এ বিষয়টি RTI এর আওতাভুক্ত নয়। শুধুমাত্র মোদী এবং তাঁর বশংবদরাই জানতে পারেন কত লক্ষ কোটি টাকা জমা পড়েছে। কে জমা দিচ্ছে তা-ও জানার কোনো ব্যবস্থা বা সংস্থান নেই। সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে যে, এমন গোপনীয়তার মাধ্যমে দেশের বহু পুঁজিমালিক নিজেদের নাম গোপন করে মোদী সেবায় ব্যাপৃত রয়েছে। তাদের দুর্নীতি নিয়েও সরকার কোনো প্রশ্ন তুলবে না। একই ছক কষে বিপুল দুর্নীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে 'নির্বাচনী বন্ড' বা Electoral Bond এর মাধ্যমে ধনরাশি একত্রিত করার অপপ্রয়াসে। দেখা যাচ্ছে যে, বিজেপি'র মতো একটি রাজনৈতিক দলের ফান্ড-এ লক্ষ কোটি টাকা জমা পড়ছে। দেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক দলই এভাবে বিপুল পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। কৌতুককর, এই নির্বাচনী তহবিলে বিজেপি'র পরেই স্থান পশ্চিমবাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের। বাস্তবে, দেশের প্রচলিত আইনকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যেসব পুঁজি মালিকরা প্রভূত সুবিধা পাচ্ছে। তারা ভরসা করে বিজেপি ও তাদের বিশ্বস্ত ক্রীড়নক তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর। এই দুটি দলই দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় সদা তৎপর। সাধারণ মানুষকে এই প্রসঙ্গটি পরিচ্ছন্ন ভাবে উপলব্ধি করেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্মাণ করতে হবে। এ নিয়ে কোনো বিভ্রম অর্থাৎ বিজেপি'র পরিবর্ত তৃণমূল কংগ্রেস বা তৃণমূলের বিকল্প বিজেপিত্র এই বোধটি অবশ্য পরিত্যাজ্য।

এখন পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, ভারতের নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার প্রচলনের মধ্যেই প্রবল দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটে চলেছে। ১৯৯১ সালে নরসিমহা রাও সরকারের আমলে নয়া উদারবাদের প্রচলন হবার পরেই শেয়ার বাজারের এক দালাল হর্ষদ মেহতার কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অবশ্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলি তদন্ত করেছিল। যৌথ সংসদীয় তদন্তও হয়েছিল। আদানির ক্ষেত্রে কিছুতেই তা করতে মোদী রাজি নন। তদন্ত চলাকালীন সময়েই হর্ষদ মেহতা মারা যায়। সেই ঐতিহাসিক কেলেঙ্কারির তুলনায় বর্তমান কেলেঙ্কারি বহু বহুগুণ বড়। দুটি ঘটনায় একটি মিল আছে। দুজনেই গুজরাতবাসী। আর এবারের এই কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে অদ্যাবধি কোনও তদন্তের উদ্যোগই কেন্দ্রীয় সরকার নেয়নি।

পূর্ব মেদিনীপুর সংবাদ

গত ২৬ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ডাকে বিকাল ৩টায় নিমতলা থেকে শুরু হয়ে মানিকতলা ও রাধামনি হয়ে নিমতৌড়ি পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য ট্রাক্টর ও মোটর সাইকেল মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল শেষে নিমতৌড়িতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কৃষি নীতির ও ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ সভার পক্ষে বক্তব্য রাখেন কম. সর্বেশ্বর মাইতি। তিনি বলেন ''দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের চাপে মোদী সরকার কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। কৃষকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মাধ্যমে মোদী সরকার দেশের অন্নদাতাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'' সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার সভায় অন্যান্য বামপন্থী কৃষক সংগঠনের থেকে বক্তব্য রাখেন কম. সত্যরঞ্জন দাস, কম. মহাদেব মাইতি, কম. মনোতোষ সামন্ত, কম. ইব্রাহিম আলী সহ অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কম. সুবল সামন্ত, কম. নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত, কম. হাসান আলি, কম. মোহসীন আলী, কম. সাধন দে, কম. দীপ্তেন্দু সামন্ত, কম. সুরঞ্জন সামন্ত, কম. স্বপন রায় সহ এস কে এসের কর্মী সমর্থকবৃন্দ।

গত ২৬ জানুয়ারি জেলা বামফ্রন্টের পক্ষে ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে ভারতের সংবিধান রক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ তুলে ধরতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরের হাসপাতাল মোড়ে একটি পথ সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত পথ সভায় আর এস পি দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কম. সুবল সামন্ত। তিনি বলেন, ''বিজেপি আজ আর এস এসের হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান স্লোগানকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে দেশের সংবিধানকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। সংখ্যালঘু বিদ্বেষী এই সরকার গরীব শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষদেরকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রেখে তাদের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস করছে। তাদের আরও গরীব করছে। আর সব হচ্ছে কয়েকটি কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে ও আর এস এসের মদতে।'' সভায় বামফ্রন্টের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কম. নিরঞ্জন সিহি, কম. গৌতম পাণ্ডা, কম. অশ্বিনী সিনহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আর এস পি দলের পক্ষে উপস্থিত আছেন কম. সুবল সামন্ত, কম. সর্বেশ্বর মাইতি, কম. নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত, কম. হাসান আলি, কম. বলদেব মাজী, কম. চিত্তরঞ্জন দিন্দা, কম. দিলীপ ঘড়া, কম. বৃহস্পতি মাইতি, কম. গায়ত্রী মাজী, কম. নাসের আহমেদ, কম. জামাল সেখ, কম. শক্তিপদ সরকার সহ অন্যান্য দলীয় কর্মী সমর্থকবৃন্দ।

গত ২৮ জানুয়ারি জনপ্রতিনিধি সহ গণ আন্দোলনের কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে তমলুক নাগরিক সমিতির পক্ষে তমলুক পৌরসভার মানিকতলায় একটি মিছিল ও পথসভা সংগঠিত হয়। এই পথসভায় এলাকার বিশিষ্ট তরুণ শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত বলেন, ''সরকারের আবাস যোজনা সহ একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে বিরোধী বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী সহ বিরোধী আই এস এফের কর্মীদের তৃণমূল সরকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় গ্রেফতার করেছে। তৃণমূল নেত্রী বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় বিধানসভা ভাঙচুর, সিঙ্গুরে হাইরোড অবরোধ করে অনশন কর্মসূচি সহ একাধিক ধ্বংসাত্মক আন্দোলন করলেও বামফ্রন্ট সরকার পুলিশি আক্রমণ নামিয়ে আনে নি। তৃণমূল ভয় পেয়েছে। আবাস যোজনায় বঞ্চিত গরীব মানুষ ওদেরকে পঞ্চায়েতে ঘাড়ধাক্কা দিতে তৈরী হচ্ছে।'' নাগরিক সমাজের পক্ষে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আন্দোলনের নেতা গৌতম পাণ্ডা, গণ আন্দোলনের নেতা চন্দ্রশেখর পান্ডা সহ অধ্যাপক শিক্ষক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নাগরিক সমাজের পক্ষে সভায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা আন্দোলনের নেত্রী ঋতা দত্ত, যুব আন্দোলনের নেতা কম. গৌরাঙ্গ কুইল্যা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

গত ২৯ জানুয়ারি ময়নায় বামপন্থী প্রগতিশীল ফ্রন্টের পক্ষ থেকে একটি মিছিল ও পথসভা সংগঠিত হয়। সভায় আর এস পি দলের নেতৃত্বের পক্ষে কম. সর্বেশ্বর মাইতি ও কম. নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত বক্তব্য রাখেন। কম. সর্বেশ্বর মাইতি বলেন, ''তৃণমূল পঞ্চায়েত ভোটের আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিতে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের নামে নতুন করে মিথ্যা মামলা করেছে। অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহার করে নৌশাদ সিদ্দিকী সহ গ্রেফতার হওয়া সকলকে মুক্তি দিতে হবে।'' সভায় কম. নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত বলেন ''বিরোধী বিধায়ককে জামিন অযোগ্য ধারা দিলেও তৃণমূলের তাজা ছেলে আরাবুলের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বিজেপি'র জুজু দেখিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি তৃণমূলের কাছে বুমেরাং হবে। রাবণ যেমন ব্রাহ্মণবেশে সীতা অপহরণ করেছিল তেমনি আমাদের মাননীয়া হিজাব পরে মুসলিম সাজার নাটক করছেন। তৃণমূল সরকারের আমলে আজকে গোটা দেশের তুলনায় এ রাজ্যের সংখ্যালঘুদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবনতি দ্রুত ঘটছে।'' বাম প্রগতিশীল ফ্রন্টের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কম. বিমলেন্দু মাল, কম. অমিতাভ রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আর এস পি দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কম. সুবল সামন্ত, কম. দীপ্তেন্দু সামন্ত, কম. সাধন ঘোড়াই, কম. গৌরহরি বেরা সহ অন্যান্য দলীয় কর্মী সমর্থকবৃন্দ।

পুঁজিবাদের বিবর্তন : একুশ শতকের পুঁজিবাদ (২)

তুষার চক্রবর্তী

এই লেখার প্রথম পর্বের সারমর্ম ছিল বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হবার জন্য ও বিজয় অর্জনের জন্য একদিকে যেমন ''একুশ শতকের সমাজতন্ত্রের'' নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে খোলামন ও সন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে তাকানোর প্রয়োজন আছে, তেমনি অন্যদিকে— আরো বেশি প্রয়োজনীয় ও জরুরি কাজ হলো একুশ শতকের পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যকে বোঝা। কেননা, শত্রুকে ভালভাবে না চিনলে কোনো যুদ্ধেই তার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয় না।

এই আলোচনায়, অতি সংক্ষেপে প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। একটি আজকের পুঁজিবাদে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে, যা পুঁজিবাদের নবনীকরণ ঘটিয়ে তাকে সচল রাখছে। দ্বিতীয়টি, পুঁজিবাদের ভৌগোলিক স্থানান্তরণ।

মার্কস ও লেনিনের লেখা ব্যবহার করে আমরা প্রায় আপ্তবাক্যের মতো একথা বলি যে পুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর পার হয়ে মুমূর্ষু দশায় বা পতনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ, সমাজ বিকাশের জন্য, উন্নয়নের জন্য, এখন সমাজ পরিবর্তন ও সমাজতন্ত্র আনয়ন ছাড়া কোনো অন্য পথ নেই। বর্তমানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বস্বান্ত হওয়া, ভিটেমাটি ছাড়া ও উচ্ছেদ হওয়া গরিবের সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের সঙ্গে আলোচনায় এ কথা বলা অর্থবহ। কিন্তু, মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সমাজের বাকি অংশের কাছে ও বিশেষ করে জিজ্ঞাসু তরুণ ছাত্ররা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন তোলেন।

প্রথমত, পুঁজিবাদী দেশগুলি ও তাদের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান ক্রমবর্ধমান। সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সাধারণ নজরে দেখলে ঈর্ষনীয়। এবং তাদের সমৃদ্ধি ও প্রতাপ দেখলে পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু দশা নজরে আসে না। বরং, যে দেশ পুঁজিবাদী বিকাশে যতই পিছিয়ে থাকা, নতুবা সমাজতন্ত্র ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা, ক্ষয়িষ্ণুতা তাদের মধ্যেই বেশি করে চোখে পড়ে। বস্তুত, এ সব সমাজতান্ত্রিক দেশের পতন তো বাইরের আক্রমণে ঘটেনি, সেখানে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল অনেকটা এই কারণেই। সমাজতন্ত্র অনুশীলনের সমস্যার মধ্যে আপাতত না ঢুকে—পুঁজিবাদী আপাত সমৃদ্ধির ও প্রবৃদ্ধির কথাই প্রথমে ভাবা যাক।

পুঁজিবাদী দেশগুলির ক্ষয়িষ্ণুতার পরিবর্তে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির একটি কারণ অবশ্যই তাদের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। **পুঁজিবাদের সঞ্জীবনী শক্তির মধ্যে উল্লেখ করবার মতো দিক হলো উচ্চপ্রযুক্তির উদ্ভাবনা ও তাকে কাজে লাগানো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কোনো সীমা নেই। পুঁজিবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সামরিক ও সামাজিক দুই দিক থেকেই—পুঁজির স্বার্থে প্রযুক্তিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। যার ফলে পুঁজিবাদী সমাজ ধাবিত হচ্ছে প্রযুক্তির রথে। এবং, পুঁজিবাদের মুনাফার কেন্দ্র এখন প্রযুক্তির পেটেন্ট, রয়ালিটি অর্থাৎ মেধাসত্ব। আবার এই সব প্রযুক্তি পুঁজিবাদী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শুধু নয়, এমনকি বিরোধিতা ও সংকট দমনের জন্য কার্যকরী ফ্যাসিবাদের অন্যতম আশ্রয় হয়ে উঠেছে।** আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বুঝতে গেলে তাই প্রযুক্তির প্রশ্নে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

একুশ শতকের পুঁজিবাদ তার মৌলিক পুঁজিবাদী চরিত্র এতটুকুও হারায়নি। কিন্তু, উনিশ ও বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে, একের পর এক সংকটের মধ্য দিয়ে চলতে তা অনেক নতুন নতুন বৈশিষ্ট, কৌশল ও আচরণ আয়ত্ত করেছে। আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ভূমিকা তার একমাত্র না হলেও অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুনাফা বর্ধন ছাড়াও আজকের পুঁজিবাদে প্রযুক্তির ভূমিকা বহুমুখী। শারীরিক ও রুটিন মানসিক কাজে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা তা কমিয়ে আনছে। কলকারখানা ছোট ও বিকেন্দ্রীভূত হয়ে প্রায় উবে যেতে বসেছে। বেশিরভাগ শ্রমিক চুক্তিতে খাটছে। সংগঠিত শ্রমিকের যে অনুশীলন ও সংহতি তা থেকে এরা বঞ্চিত। আজকের বাজারের চেহারাও বদলে গেছে। বদলে যাচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। সবটাই সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির মারফৎ।

আবার, অধুনা তথ্য প্রযুক্তি, ডিজিট্যাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পুঁজিবাদী মালিকের হাতে তুলে দিয়েছে বাণিজ্যের আড়ালে, সার্বিক নজরদারি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অসীম ক্ষমতা। যেমন, নতুন ৫-জি টেকনোলজির ঘোষিত লক্ষ্য ইন্টারনেট ও সংযোগের গতিবৃদ্ধি হলেও তার মূল উদ্দেশ্য ভিন্ন। ফাইভ-জি প্রযুক্তির মাধ্যমে গৃহস্থালীর প্রতিটি যন্ত্র মারফৎ ব্যবহারকারী প্রতিটি মানুষ ও পরিসর চব্বিশঘণ্টা নজরদারির আয়ত্বে চলে আসবে। সংগ্রহ করবে যাবতীয় ডেটা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার মারফৎ পুঁজির শত্রু মিত্র চিহ্নিত করবে। যা ফ্যাসিবাদের অস্ত্র।

পুঁজিবাদের বর্তমান যুগে দুনিয়াজুড়ে ফ্যাসিবাদ আসছে কোনো রাজনৈতিক নেতার মধ্য দিয়ে নয়। আজকের ফ্যাসিবাদ উঠে আসছে যন্ত্র ও প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে। আমরা এমন এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছি যেখানে শাসক রাজনীতির নেতারা হয়ে যাচ্ছে পুতুল আর যন্ত্র হয়ে উঠেছে শাসক। অথচ, নগরায়ন, জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং পশ্চিমের ভোগবাদী জীবনের বহু বিজ্ঞাপিত আকর্ষণ, এই সব প্রযুক্তির নিবেশ কার্যত অনিবার্য করে তুলছে। এই সব প্রযুক্তির মানবিকীকরণ ও সামাজিকীকরণ যে সমাজতন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়, সেই কথাটা না বলে এ সব প্রযুক্তির ঢালাও বিরোধিতা করাও তাই সম্ভবপর নয়।

মূল কথা হলো, উন্নয়ন ও উন্নত প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি আজকের পুঁজিবাদ নিজের বজ্রমুষ্ঠি কঠিন করছে ও প্রযুক্তি কৌশলে তা লুকিয়েও রাখছে। দুনিয়ার শিক্ষিত মানুষ ও বিশেষজ্ঞরা জানলেও, এ বিষয়ে তারা নিশ্চুপ। দুনিয়ার মধ্যবিত্তদের দারিদ্রের পাপচক্রে নিক্ষেপ করা, কায়িক ও মানসিকভাবে শ্রমজীবীদের মধ্যযুগীয় ক্রীতদাসের স্তরে নামিয়ে আনা, অসাম্য ও বৈষম্যের বিস্তার, এসব নাগরিকদের কাছে যতটা স্পষ্ট, গণতান্ত্রিক পরিসরের মধ্যে পুঁজির স্বার্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা ও বাড়িয়ে তুলবার ঘটনা সেই তুলনায় অদৃশ্য অনালোচিত থেকে যাচ্ছে। যে ঘাটতি পূরণ করতে হবে আমাদের।

ভারতেও আজকের পুঁজিবাদ দ্রুতলয়ে প্রসারিত হচ্ছে এই সব প্রযুক্তির আশ্রয়ে। ভারতে বর্তমানের পুঁজিবাদী প্রসারকে চিহ্নিত করা যায়, পণ্যায়ন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রসার এবং অতিধনীদের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। যদিও এই পর্বে বিপুল সংখ্যক গরিবের শেষসম্বল ও শ্রম লুঠ করেই ভারতে অল্পসংখ্যক ধনী দ্রুত অতিধনী হয়ে উঠছে, কিন্তু —পূর্বোক্ত পণ্যায়ন, প্রযুক্তি, পরিকাঠামোর চাকচিক্য ও ধনকুবেরদের চোখ-ধাঁধানো বৈভব দারিদ্রকে ঢেকে দেশের অগ্রগতির এক বিভ্রম তৈরি করছে।

অথচ, ধনবৈষম্য এতই আগ্রাসী আকার ধারণ করেছে যে Oxfam নামের একটি অসরকারী সংগঠন তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে পুঁজিবাদীদের সতর্ক করতে বাধ্য হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের তথাকথিত Survival of the fittest যা যোগ্যতমের উর্দ্ধতন বা টিকে থাকার তত্ত্বকে ভর করে একুশ শতকের এই অবস্থাকে বলেছে Survival of the richest, অর্থাৎ ধনীতমদের উর্দ্ধতন।

ভারতে পুঁজিবাদের দ্রুত প্রসার অতীতে যে সব কারণে আটকে ছিল— তার অনেকগুলি, যেমন দক্ষ শ্রমিক, ম্যানেজার, ইত্যাদি তৈরির কঠিন কাজ এড়িয়ে যাবার বাইপাস বা উপপথ এনে দিয়েছে আজকের প্রযুক্তি। আবার মোবাইলের প্রসার আমজনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিপুল ক্ষমতা তুলে দিয়েছে পুঁজি ও বাজারের হাতে। যাকে বলা হতো গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, সেই খবরের কাগজ ও যাবতীয় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা কার্যত উবে গেছে। পুরনো শিল্পমালিকদের সরিয়ে, সারা বিশ্বের মতো ভারতেও পুঁজির শীর্ষ মালিকানা ও ধনপতিদের আসন দখল করে নিচ্ছে নতুন একদল ডিজিট্যাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবসায়ীরা। এই অবস্থার মোকাবিলা করার পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

বিশ্বে পুঁজিবাদের ভূ-অর্থনীতি ও ভূ-রাজনীতির বিন্যাসেও ঘটেছে নাটকীয় পরিবর্তন। পশ্চিম বিশ্ব থেকে সরে, এশিয়া হয়ে উঠছে আজকের পুঁজিবাদের কেন্দ্রভূমি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নতুন সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে তার একটি প্রতিপক্ষ তৈরি হয়। আর, এর বাইরে ছিল ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত অধিকাংশ দেশ, যেখানে পুঁজিবাদের বিশেষ প্রসার ঘটেনি। এই ভূ-অর্থনীতি ও রাজনীতিকে সচরাচর তিন বিশ্বের মডেলে হিসেবে তখন ব্যাখ্যা করা হতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙ্গে যাওয়া, চিন ও ইন্দোচিনের পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ, ও শেষে ওয়াশিংটন ঐকমত্য বিশ্বায়নের যুগে সাময়িকভাবে একমেরু বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধাঁচ তৈরি করে। কিন্তু, এই পর্বে পুঁজিবাদের মূলকেন্দ্র ক্রমশ সরে আসছিল এশিয়ায়।

পুঁজিবাদের প্রসারণ একুশ শতকে ভূ-অর্থনীতিকে একেবারেই বদলে দিয়েছে। জাপান, চিন, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া যে মহাদেশে বিরাজ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী জোট এর মধ্যে একমাত্র জাপানকেই এখনো কব্জা করে রাখতে পেরেছে। এই অবস্থায় ইউরোপ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে নিজেকে প্রথমে অর্থনৈতিক পরে রাজনৈতিকভাবে জোটবদ্ধ করেছে। ফলে, পুঁজিবাদী বিশ্ব এখন আর একমেরুও নয়।

পুঁজিবাদের নতুন বিন্যাসের ভিত্তিতে চিন-মার্কিন সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী। যা অবশেষে শুরু হয়ে গেছে। এই চিন-মার্কিন বাণিজ্যযুদ্ধ আজকের বিশ্ব রাজনৈতিক-অর্থনীতির অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক বিন্দু। চিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পুঁজিবাদের উত্থান হলেও চিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধি ও বিকাশে ক্রমশই ছাপিয়ে যাচ্ছে। আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নিপুঁজি এখনও অনেকাংশে চিনের শিল্প-উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। চিনের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজির আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা, বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাপিয়ে যাওয়া, আমেরিকার চিনের কাছে বিপুল বৈদেশিক ঋণ পুঞ্জীভূত হওয়া, এবং আমেরিকায় বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান বোঝা এই চার সমস্যায় মার্কিন শাসকশ্রেণি নাস্তানাবুদ। অবশেষে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সামনে রেখে, মুক্তবাণিজ্যের স্বঘোষিত নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে, তারা চিনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে নেমেছে। অথচ, এই বাণিজ্যযুদ্ধে চিনের স্বল্পমেয়াদী ক্ষতি হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজির মালিকদের ক্ষতি সর্বাধিক। তারা পড়েছে দোটানায়। ফলে, আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা এক অগ্নিগর্ভ সংঘাতময় ও জটিল পরিস্থিতিতে প্রবেশ করেছে।

ভারতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্রুত প্রসার ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীদের ক্রমশ মাথাব্যথার কারণ হয়েউঠেছে। বিজেপি ও আর এস এসের হিন্দুত্বের চাইতেও ভারতে পুঁজিবাদের উত্থান তাদের চোখে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা, একে না পারছে গিলতে—না বিরোধিতা করতে। কিন্তু, চিনের বিরুদ্ধে ভারতকে ঘুঁটি হিসেবে চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। ভারতের পুঁজিবাদীরা এখনো অস্ত্র বা সামরিক ব্যবসায় শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি—যাতে যুদ্ধ তাদের কাছে লাভজনক হতে পারে। অন্যদিকে, বিদেশি লগ্নির লোভে, ভারত আই এম এফ ও বিশ্বব্যাংকের একচ্ছত্র শাসন থেকে খানিকটা বেরিয়ে রাশিয়া ও সাংহাই কোঅপারেশনের দিকে ঝুঁকে পড়বার সঙ্গে বিবিসি'র নরেন্দ্র মোদির কুকীর্তি পুনশ্চ সামনে আনা ও আদানির ফাটকাবাজি ফাঁস করার যোগসূত্র থাকাও বিস্ময়কর নয়। আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় ভৌগোলিক স্থানান্তরণ ও চিনের উত্থান দুটি প্রধান ঘটনা।

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রেও মূল প্রতিবন্ধকতা পুঁজিবাদী দুনিয়ার এই টালমাটাল পরিস্থিতি। অতিমারি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ইত্যাদির আড়ালে আজকের অতিদক্ষ অতিশোষণ-মূলক একুশশতকের পুঁজিবাদ দুনিয়ার দারিদ্র বৃদ্ধি করলেও, দরিদ্রের জন্মহার দ্রুত কমাচ্ছে। বাড়াচ্ছে মৃত্যুহার ও আত্মহত্যা। আজকের তরুণ দম্পতিদের সন্তান ধারনের সঙ্গতি এমনকি, ইচ্ছাটুকুও কেড়ে নিচ্ছে। দুনিয়ায় এই প্রথম জনসংখ্যাবৃদ্ধির বদলে পুঁজিবাদের যেখানে যেখানে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি—সেখানে ততো জনসংখ্যার সংকোচন ঘটতে দেখা যাচ্ছে। ইউরোপ, জাপান, চিনের পর যা ঘটতে চলেছে ভারতেও। প্রকট মহামারী বা দুর্ভিক্ষ ছাড়াই—পুঁজির শোষণ এখন নীরবে জন-সংকোচনের কাজেও নিযুক্ত।

অথচ এই ব্যবস্থাকে আধুনিকতার সমার্থক ও উন্নত বলে মনে করেন এমন মানুষের অভাব ভারতে ও সারা বিশ্বে নেই। এমনকি নিজেদের কমিউনিস্ট বলে যারা ঘোষণা করেন তাদের মধ্যেও অনেকেরই বিশ্বাস—সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে গেলে ইউরোপীয় কায়দায়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই সকল দেশ ও সমাজকে যেতে হবে।

কার্ল মার্কস—ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, অর্থনীতির নিয়মে, সংকট

এরপর ৮ পাতায়

Vol. 70 Issue No. 24 শনিবার, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

Postal Regd. No. SSRM/KOL.-RMS/W.B./R.N.P. 206/2007-09
Licenced to post without pre-payment/Licence No. MM & PO/
SSRM-KOL-RMS/R.N.P. 206/LPWP 042/2007-09

মোদী-আদানির ফাঁস আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করছে

শঙ্খ শুভ্র বিশ্বাস

বছর তিরিশ আগে অবধি ট্র্যাডিশনাল বাঙালির জীবনের বাজারের কথা উঠলেই প্রথমেই মাথায় আসতো বড় বাজারের কথা। ফেলুদার গল্প হোক বা ব্যোমকেশ এমনকি, ঘনাদার গল্পেও একাধিক বাজারের উল্লেখ আছে। তবে বাজার বলতে প্রথমেই যে কথা আমাদের মাথায় আসতো তা হলো, একটি জনবহুল এলাকা, প্রচুর দোকান, বহু মানুষের কোলাহল এবং প্রাণোচ্ছল একটি পরিস্থিতি। তবে এই বাজারে গরিব থেকে বড়লোক সবার জন্য কিছু না কিছু পাওয়া যেত। হয়তো ভরা বাজারে সব থেকে বড় মাছ পেত সব থেকে ধনী লোকটা কিন্তু পাড়ার গরিব মাস্টারমশাইয়ের জন্য ভাল মাছ আলাদা করে রাখা থাকতো। তবে ১৯৯১-৯২ সালের পর থেকে সময় বদলে গেল।

সরকার নিজের অবস্থান বদলের ফলে হঠাৎ করে গোটা দেশটাই বাজারে পরিণত হয়ে গেল। তবে এই বাজারের পার্থক্য হল আগের মতো এই বাজারে গরিবের জন্য কিছু নেই, যা আছে সবই বড়লোকদের জন্য। এই বাজারে পাড়ার গরিব মাষ্টারের জন্য কিছু ভাল জিনিস রাখা থাকে না বরং অনবরত চেষ্টা চলতে থাকে খারাপ জিনিস বেশি দামে বিক্রি করার। এর ফলে সামগ্রিক সমাজে একটা পরিবর্তন দেখা গেল, জনগণের জীবনের জনকল্যাণ মূলক সিকিউরিটি বাজারজাত হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষের জীবনের উপর বাজারের প্রভাব বদলে গেল।

এর আগে আমাদের জীবনে বড়বাজারের প্রভাব ছিল কিন্তু এই প্রভাব চেষ্টা করে কাটিয়ে যাওয়া যেত ঠিক যেভাবে মাসের শেষে বড় মাছের জায়গায় ছোট মাছ কেনার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনে বাজারের প্রভাব খানিক হলেও কমানো যেত কিন্তু ১৯৯২ সালের পর থেকে বাজার আমাদের উপর চেপে বসলো। এর ফলে চেষ্টা করেও বাজারের প্রভাব আমাদের উপর থেকে কমানো যাবে না। ঠিক এই ভাবেই আজকের বাজার গরম করা আদানির শেয়ার বাজারে জালিয়াতির ঘটনায় সাধারণ মানুষের কোনো হাত না থাকলেও এর ফলাফল থেকে জনগণ চেষ্টা করলেও পালাতে পারবে না।

এই ঘটনা সম্পর্কে একাধিক পক্ষে এবং বিপক্ষে মতামত বাজারে থাকলেও যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে প্রায় সবাই পালিয়ে বেরাচ্ছে তা হল এই ঘটনার পেছনে রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং এই ঘটনার মূল কারণ কি? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা খুঁজতে পারি তাহলে আজকের সমাজ জীবন এমন এক আয়নার সামনে দাঁড়াবে যেখানে প্রত্যেকের ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি এতই ঝাপসা যে চেষ্টা করেও কেউ স্পষ্ট ধারণা করতে পারবে না। ফলে আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা ভীষণ জরুরি। উত্তরে যাওয়ার আগে প্রথমেই আমরা বুঝে নি আদানির জালিয়াতির ঘটনাটি আসলে কি? প্রধানত তিনভাবে এই জালিয়াতির ঘটনা সংগঠিত হয়। গত তিনবছরের ইতিহাস যদি খেয়াল করি তাহলে দেখবো গৌতম আদানির সম্পত্তির পরিমাণ ১২০ শতাংশ বেড়েছে এবং এর পেছনে প্রধান কারণ শেয়ারের দামের বৃদ্ধি। আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারের দাম গত তিন বছরে গড়ে ৮৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই বৃদ্ধির পদ্ধতি কি? সাধারণভাবে বললে বলা যায় শেয়ারের দাম মূলত নির্ভর করে শেয়ারের চাহিদা এবং সরবরাহের উপর। বাস্তব জীবনের উদাহরণ নেওয়া যাক, স্বাধীনতার আগে যুদ্ধের সময় আমরা কালোবাজারির কথা শুনেছি। বাস্তবে যদি আমরা দেখি যে কালোবাজারি আসলে কি, তাহলে দেখবো বাজারে উৎপাদিত চালে কোনো একজন কিনে মজুত করছে এর ফলে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় বাজারের দামের থেকে বেশি দামে চাল বিক্রি হচ্ছে। একেই বলে চালের কালো বাজারি।

শেয়ার বাজারে আদানির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। একদিকে বাজারে খুব অল্প পরিমাণ শেয়ার ছেড়ে রাখা হয়েছে আদানির তরফ থেকে। ফলে বাজারে শেয়ারের সরবরাহ প্রথম থেকেই কম ছিল। অন্যদিকে আদানি গোষ্ঠী মরিশাস, ব্যাংককের মতো দেশে ভুয়ো কোম্পানি তৈরি করে বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ নিজেদের শেয়ার কিনে শেয়ারের চাহিদা বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে শেয়ারের দাম উর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে সরকার আদানি গোষ্ঠীকে বিপুল সাহায্য করে।

শেয়ার বাজারের সাথে বাস্তব বাজারের পার্থক্য হল মানুষ বাজারে যায় তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে কিন্তু শেয়ার বাজার চলেই ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে। ফলে কোনো বেসরকারি সংস্থা যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবসার জন্য নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে এবং এই ক্ষেত্রে যদি সেই সংস্থার কোনো প্রতিযোগিতা না থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া যায় সেই সংস্থা ভাল করবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শেয়ারের দাম বাড়তে শুরু করে।

গত কয়েক বছরে মোদী সরকারের বদান্যতায় একের পর এক বন্দর, বিদ্যুৎ সংস্থা, এয়ারপোর্ট সরকার আদানির কাছে বিক্রি করতে শুরু করে। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এই ক্ষেত্রগুলিতে আদানি ভারতের একমাত্র শিল্পপতি হতে শুরু করে। সবাই মনে করতে শুরু করে আদানির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ফলে শেয়ারের চাহিদা বাড়তে শুরু করে কিন্তু প্রথম থেকেই বাজারে শেয়ারের পরিমাণ কম থাকায় জোগানের তুলনায় চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বাভাবিকভাবে এই সময়ের মধ্যে আদানির শেয়ারের দাম বাড়তে শুরু করে। এক্ষেত্রেও বিজেপি সরকার আদানিকে সাহায্য করে। SEBI-র নিয়ম অনুযায়ী কোনো সংস্থাকে বাজারে ন্যূনতম ২৫ শতাংশ শেয়ার ছেড়ে রাখতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আদানি গোষ্ঠী বাজারে কৃত্রিম চাহিদা তৈরির জন্যে বিদেশে ভুয়ো কোম্পানি তৈরির মাধ্যমে শেয়ার কিনে নিজেদের দখলে রাখে প্রায় মোট শেয়ারের প্রায় ৯৩ শতাংশ। SEBI জানা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রক সংস্থা এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

তবে এক্ষেত্রে একথা সত্যি যে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ বর্তমানে ভারতের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে। ফলে এই জালিয়াতির ফলে সাধারণ মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলা যায়? শেয়ারের দাম বৃদ্ধিকে হাতিয়ার করে আদানি গোষ্ঠী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মতো সংস্থার থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছে। সাধারণ মানুষের শীর্ষ ব্যাঙ্ক এই ধরনের সংস্থাকে ঋণ দেয় তাঁদের ব্যবসার কথা মাথায় রেখে অর্থাৎ, আদানি গোষ্ঠী সহজে ঋণ পেয়েছে কারণ, নিজের ক্ষেত্রে আদানি একমাত্র শিল্পপতি ফলে তাদের শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পাবে দিনে দিনে এবং ঋণ খেলাপি হওয়ার আগেই ব্যাঙ্ক প্রয়োজনে এই শেয়ার বিক্রি করে নিজেদের লোকসান হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবে। এছাড়াও LIC এর মতো সংস্থা এই আদানি গোষ্ঠীতে বিনিয়োগ করেছে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত টাকা এবং ধরে নেওয়া হয়েছিল, লাভের অংশ জনগণের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু শেয়ারের দামে বৃদ্ধি করা হয়েছিল জালিয়াতির মাধ্যমে এবং এই ঘটনা সামনে আসার ফলে LIC এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিনিয়োগ করা সমস্ত টাকা লোকসান হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ।

এবার যদি আমরা উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তরে ফিরে আসি তাহলে দেখবো এই ধরনের জালিয়াতির পেছনে সরকারের প্রত্যক্ষ মদত আছে। একদিকে যেমন বিভিন্ন নিয়ম থাকা সত্ত্বেও সরকারের পছন্দের ব্যবসায়ীরা নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ব্যবসা করছে এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। ঠিক যেমন আদানির ক্ষেত্রে হয়েছে। তবে এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি আজ আমাদের সামনে এসেছে তা হলো "এই ঘটনার মূল কারণ কি?"

শেষ কিছুদিন ধরে আমরা দেখছি একের পর এক ব্যবসায়ী দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। কিন্তু এর কারণ কি? একথা কোনভাবেই সত্যি নয় যে, ব্যবসায়ীরা যদি ব্যবসা করে বেশি মুনাফা কামাতে পারতো তাহলে তাঁরা বেশি ব্যবসা করতো না। আদতেই বাস্তব ঘটনা হল তাঁদের ব্যবসা আর মুনাফা কামাতে পারছিলো না এবং এর একমাত্র কারণ পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। শেয়ার বাজারকে যদি খেয়াল করি তাহলে দেখবো একাধিক শেয়ারের দাম বেড়েছে করোনার সময়ে।

যদি ধরে নিই শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায় সংস্থা ব্যবসা করলে, করোনার সময়ে সমস্ত ব্যবসা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শেয়ারের দাম বেড়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, কিভাবে এটা হওয়া সম্ভব? বাস্তবে যদি খেয়াল করি তাহলে, দেখবো সরকার একের পর এক সহজে ঋণ নেওয়ার স্কিম ঘোষণা করেছে। তবে শুধু এই দেশে নয় সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে এই ঘটনা। সরকার এত সস্তা হারে ঋণ দিতে শুরু করেছে যার ফলে সংস্থাগুলি ঋণ নিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে নিজের শেয়ার কিনে কৃত্রিম চাহিদা তৈরির মাধ্যমে ফাটকা বাজারে বিপুল পরিমাণ লাভ করেছে। এর ফলে একদিকে সরকারের সাহায্য অন্যদিকে উৎপাদন না করে সহজে বিপুল পরিমাণ লাভ করার সহজ রাস্তা পুঁজিপতিদের জন্য মুনাফা তৈরির প্রধন উপায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উল্টোদিকে ব্যবসা এখন উৎপাদন নির্ভর না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ ছাঁটাই এবং এই সস্তায় শ্রমিককে কাজ করানো শুরু হয়েছে। এছাড়াও সরকার এই পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য শ্রম আইনকে লঘু করা শুরু করেছে ফলে একদিকে ফাটকায় মুনাফা অর্জন এবং অন্যদিকে সস্তায় উৎপাদন ও বিপুল দামে বিক্রির মাধ্যমে বিপুল মুনাফা অর্জন করছে।

ফলে আমরা বলতেই পারি সাধারণ মানুষের জীবন আজ আবর্তিত হচ্ছে ফাটকা পুঁজিকে কেন্দ্র করে এবং এই পুঁজির কৃত্রিম বুদবুদ তৈরি হওয়া বা ফেটে যাওয়ার মধ্যে সাধারণ মানুষের হাত নেই। তবে এই বুদবুদ ফেটে গেলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ গরিব মানুষ।

পুঁজিবাদ আজ এমন একটা সময়ে পৌঁছেছে যেখানে বেঁচে থাকার জন্য পুঁজিবাদকে টিকে থাকতে হবে ফাটকাবাজির উপর এবং শ্রমিকের উপর বিপুল পরিমাণ শোষণের মাধ্যমে কম মজুরির বিনিময়ে দামি জিনিস উৎপাদন করে ক্ষুদ্র সংখ্যক জনগণের মধ্যে বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা তৈরি করে। ফলে আজকে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের বদান্যতায় সংকটের মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদ টিকে আছে। জনগণের মুক্তির একমাত্র উপায় সংগঠিত প্রতিরোধ নয়তো পুঁজিপতিদের জালিয়াতি ও সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে দারিদ্রতার জালে জড়িয়ে পড়ে মারা যাবেন এই দেশের অসংখ্য খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ।

পুঁজিবাদের বিবর্তন

৭-এর পাতার পর—

যে অবশ্যম্ভাবী সেটা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করেছিলেন। বিপুল তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলেছিলেন, পুঁজিবাদ—যত দিন যাবে ততই সমাজের বিপুল গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের জীবনে চরম সংকট তৈরি করবে—যা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ সমাজতন্ত্র। তাঁর মনে হয়েছিল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত বিকশিত হবে—ততো তার গর্ভে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভূমিষ্ঠ হবার জন্য আঁকুপাকু করবে। এবং, শ্রমজীবী শ্রেণির অগ্রসর সচেতন অংশ বিপ্লবের পথে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে পুঁজির ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিকীকরণের পথে অগ্রসর হবে। সেটাই হবে বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। মার্কস কথাগুলো বলেছিলেন ইওরোপের শিল্পোন্নত দেশ, জার্মানি ও ব্রিটেনের দিকে তাকিয়ে। মনে করেছিলেন—পুঁজিবাদীরা এই সব দেশে পরাজিত হলে, দুনিয়ার বাকি অংশেও শ্রমজীবী মানুষ সেই পথ অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দিকে বীরদর্পে অগ্রসর হবে।

মার্কস এমন কথা বলেননি, যে পুঁজিবাদের বিকাশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অত্যাবশ্যক প্রাকশর্ত। বলেছিলেন—পুঁজি ও সামাজিক উৎপাদন একটা স্তরে না পৌঁছলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার সুফল প্রসব করতে পারবে না। মার্কসের কিছু কিছু লেখার সূত্র ধরে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ প্রয়োজন—এই যান্ত্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার, এই বিভ্রমে পড়বার সুযোগ যে একেবারে ছিল না এমন নয়। তাই এই বিষয়ে বিভ্রান্তির ইতিহাস বেশ পুরোনো।

রাশিয়ার এক সমাজবাদী নেত্রী ভেরা জাসুলিচ একটি চিঠিতে স্বয়ং মার্কসকে এই নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। যার জবাব দেবার জন্য মার্কস চারটি খসড়া উত্তর তৈরি করেন। এবং মার্কস প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বরূপ ও তা থেকে উত্তরণ ও সমাজতন্ত্রে পৌঁছোবার অ-পুঁজিবাদী বিকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনাও শুরু করেন। যদিও, এই কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। সেই পথটাই এ যুগের বামপন্থীদের নির্মাণ করতে হবে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-